১০ই নভেম্বর স্মরণে

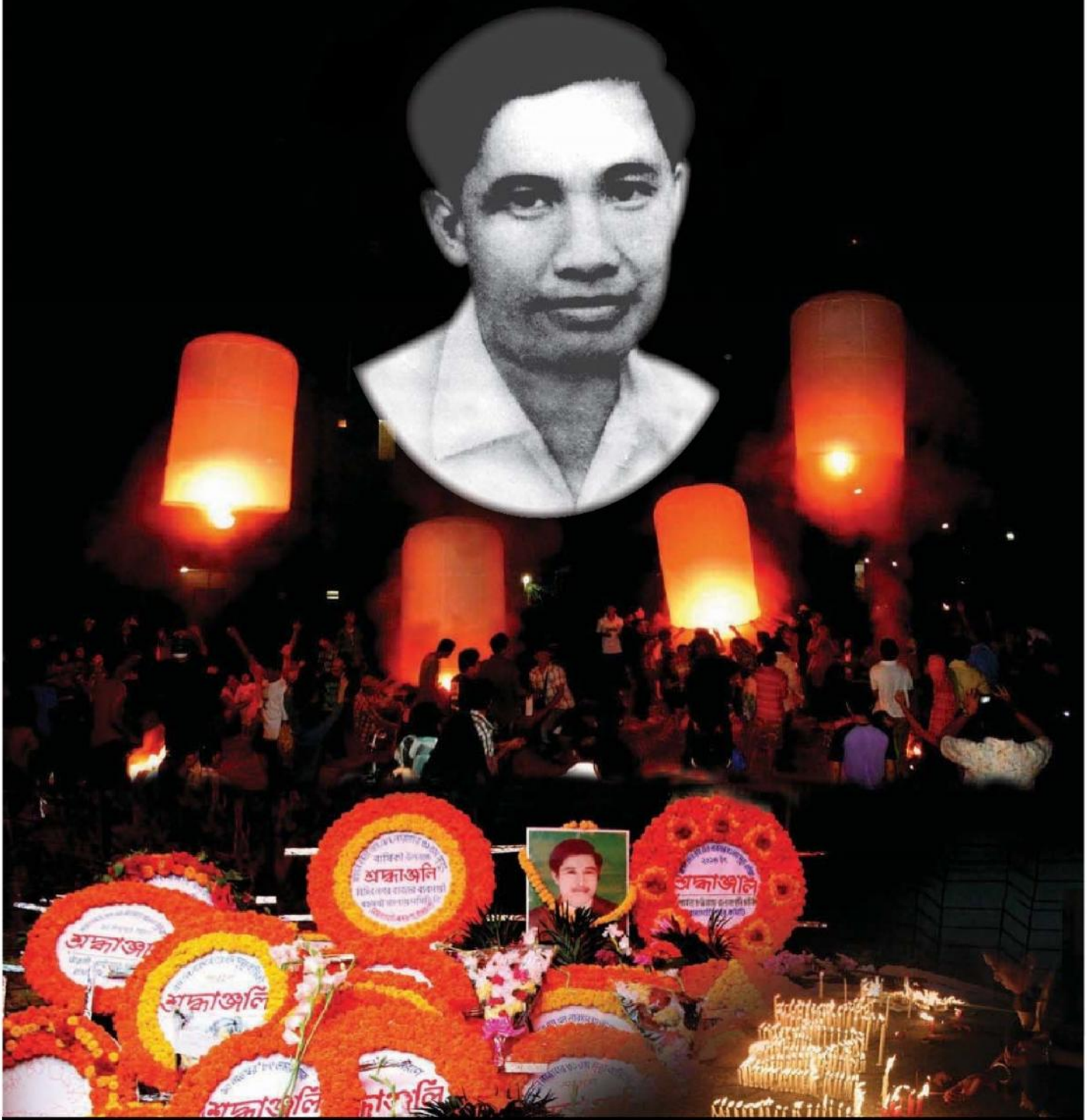

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

"যে যত আদর্শবান, সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শি হতে পারে।"

"ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ-এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।"

"যারা মরতে জানে পৃথিবীতে তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।"

-মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

১০ই নভেম্বর স্মরণে

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

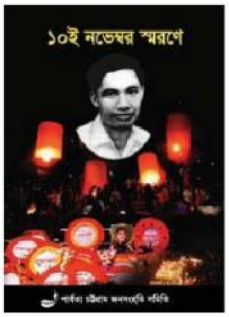

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০১৫

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss-cht.org

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/ পৃষ্ঠা ৪

প্রবন্ধঃ স্মৃতি তর্পণ
মহান বিপ্লবী এম এন লারমার স্বপ্ন ও সংগ্রাম ■ সজীব চাকমা/পৃষ্ঠা ৬
জুম্ম জাতির স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ■ পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য/পৃষ্ঠা ১০
মানবেন্দ্র লারমা : আজীবন সংগ্রামী এক নেতা ■ আব্দুল্লাহ সরকার/ পৃষ্ঠা ১৩

সাক্ষাৎকার
নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণঃ
ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন দীপায়ন খীসা / পৃষ্ঠা ১৮

প্রবন্ধঃ অধিকার ও সংগ্রাম
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : সতের বছরের পোস্টমর্টেম ■ রাহমান নাসির উদ্দিন/ পৃষ্ঠা ২০
জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ প্রসঙ্গে ■ উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা / পৃষ্ঠা ২৪
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আদিবাসী সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নির্দেশনা
ও প্রাসঙ্গিক বিষয় ■ মঙ্গল কুমার চাকমা /পৃষ্ঠা ২৭
পার্বত্য চট্টগ্রামে বনজ ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংস প্রসঙ্গে ■ চিংলামং চাক/ পৃষ্ঠা ২৯

কবিতা
প্রদীপ জ্বালাও ■ বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা/ পৃষ্ঠা ৩১

বিশেষ প্রতিবেদন /পৃষ্ঠা ৩২-৪৭
- অসহযোগ আন্দোলন জোরালোভাবে এগিয়ে চলছে
- বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়–
  শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার নতুন ষড়যন্ত্র : অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে
- রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পাহাড়ি ছাত্রদের উপর ছাত্রলীগ ও বহিরাগতদের হামলা,
  জুম্মদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং পাহাড়িদের মামলা গ্রহণে পুলিশের অস্বীকার
- জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে যেতে হবে,
  ছাত্র সমাজকে নিতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দায়িত্ব – জুম্ম ছাত্রদের প্রতি সন্তু লারমার আহ্বান

সংবাদ প্রবাহ / পৃষ্ঠা ৪৮-৫৮
জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা
সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন
সাংগঠনিক সংবাদ

সম্পাদকীয়

১০ নভেম্বর ২০১৫ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের এই দিনে বিভেদপন্থী, জাতীয় কুলাঙ্গার, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জনগণের একমাত্র পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা এম এন লারমা তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। বিভেদপন্থীদের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের অধিকারকামী জনগণ যেমন হতবাক হয়েছিল, তেমনি সংগ্রামরত জুম্ম জনতা এসব জাতীয় বেঈমানদের ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করেছিল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। অবিস্মরণীয়, শোকাবহ ও সাহসী আত্মবলিদানের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত এই দিনে প্রয়াত মহান নেতাসহ সেই সাহসী বীরদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও লাল সালাম।

১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের এক ন্যাক্কারজনক অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু পার্টির সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনীর সতর্কতা ও যোগ্যতার কারণে তাদের সেই ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হয়ে যায়। জাতীয় ও আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় সম্মেলন তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং পুনর্বার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে। ষড়যন্ত্র ও বিভেদকামিতা যাদের রক্তের শিরায় শিরায় প্রোথিত তারা কখনো ঐক্য-সংহতিতে বিশ্বাস করে না। তারা কখনোই বৃহত্তর জাতীয় ও আন্দোলনের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় না। তাই তারা বিভেদ ও ষড়যন্ত্রের ঘৃণ্য পথ থেকে সরে না এসে পার্টির অভ্যন্তরে থেকে পার্টির বিরুদ্ধেই অব্যাহতভাবে বিভেদ ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। তারা সমগ্র পার্টির মধ্যে এক চরম সঙ্কট ও অচলাবস্থা সৃষ্টির অপতৎপরতা চালাতে থাকে। কিন্তু তারা দিন দিন একের পর এক ঘটনায় কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। এমনি অবস্থায় তাদের অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠলো তারা তখন ছলনার আশ্রয় খুঁজছিল এবং সমঝোতার প্রস্তাব দিতে থাকে। অত:পর পার্টি নেতৃত্ব জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির' ভিত্তিতে এক সমঝোতায় রাজি হয়। এরপর কর্মীবাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে আবার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু তাদের সেই ঐক্যের স্বপ্ন বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। যাদের রক্তই ছিল বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের চক্রান্তে ভরা, তাদের পক্ষে ঐক্য-সংহতি কিংবা 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া' নীতি ছিল নিছক ছেলেখেলা। তাই সমঝোতার আবেগে ভাসতে না ভাসতে কর্মীবাহিনীকে হতবাক করে দিয়ে ১০ই নভেম্বরের রক্তাক্ত ঘটনার সূত্রপাত ঘটায় বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রকারীরা।

বিভেদপন্থীদের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের অধিকারকামী জনগণ যেমন হতবাক হয়েছিল, তেমনি সংগ্রামরত জুম্ম জনতা এসব জাতীয় বেঈমানদের ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করেছিল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। অবিস্মরণীয়, শোকাবহ ও সাহসী আত্মবলিদানের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত এই দিনে প্রয়াত মহান নেতাসহ সেই সাহসী বীরদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও লাল সালাম।

এম এন লারমার মৃত্যু হলেও তাঁর নীতি-আদর্শ, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, স্বপ্ন, কর্মজীবন ও দিকনির্দেশনাকে অনুসরণ করে তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার গতিতে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তৎকালীন সামরিক ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যেও জনসংহতি সমিতি তার আন্দোলনের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব ও ন্যায্যতা দেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তারই ফলশ্রুতিতে জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান ও এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণসহ স্থায়ী অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি।

কিন্তু জুম্ম জনগণের এই ঐতিহাসিক অর্জনের প্রাক্কালেও জুম্ম জনগণকে আবারও নতুন করে বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতার মুখোমুখী হতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে জুম্মদের অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী– যারা 'ইউপিডিএফ' নামে সমধিক পরিচিত- তারা সেই নতুন ষড়যন্ত্র ও বিভেদের সূত্রপাত ঘটায়। সেই সংকটের উপর মরার উপর খাড়ার ঘা-এর মতো ২০০৭-২০০৮ সালে জরুরী অবস্থা চলাকালে ১/১১-এর কুশিলবদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে তথাকথিত সংস্কারের ধোঁয়া তুলে পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টি করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিভেদকামী ও ষড়যন্ত্রকারীদের এসব সকল ষড়যন্ত্র সফলভাবে মোকাবেলা করে জুম্ম জনগণের ঐক্য-সংহতি অবিচল রেখে ও নেতৃত্বকে সুসংহত করে পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বেগবান করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় ১৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকরকরণ; আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন, পরিবেশ, স্থানীয় পুলিশ ইত্যাদি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরকরণ এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ ও তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিলকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ; ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। আপামর জুম্ম জনগণসহ দেশে-বিদেশে প্রবল দাবি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকার চরম উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে চলেছে। সরকারের পক্ষ থেকে 'চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে' বা 'চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক', '৮০% চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে', কখনো বা 'এ সরকারের আমলে ৯০% চুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে' ইত্যাদি বুলি আওড়িয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে যথাযথ ও দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ ১৩-দফার ভিত্তিতে সংশোধনের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সরকার উক্ত আইন সংশোধনে অব্যাহতভাবে কালক্ষেপণ করে চলেছে। অপরদিকে সরকার চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পেশীশক্তি দিয়ে জোর করে সরকার বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। জনমতের বিপরীতে অর্ন্তবর্তী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ থেকে ১৫ জনে বৃদ্ধি করে অগণতান্ত্রিক ও দলীয়করণের ধারা আরো জোরদার করা হয়েছে। চরম দুর্নীতি, অনিয়ম ও দলীয়করণের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থাকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে পদদলিত করে জুম্মদের মৌজা ও জুম ভূমির উপর সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে শত শত একর ভূমি ইজারা প্রদান করে এবং পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা করে জুম্মদেরকে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। দেশে-বিদেশে প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের ভ্রমণে ও জুম্মদের সাথে বিদেশী/দেশীয় সংস্থার লোকজনের সাক্ষাতে বিধি-নিষেধ আরোপ, পাহাড়ি পুলিশ সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমতল অঞ্চলে বদলিসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও বর্ণবাদী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এক নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

এমনিতর পরিস্থিতিতে এই জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হচ্ছে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অধিকতর সুদৃঢ় করা। আর এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে, আন্দোলনের কর্মসূচিকে এবং জাতীয় নেতৃত্বকে একমুখী করা এবং ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে একাট্টা করা। তাই জুম্ম জনগণের এই শোকাবহ দিনে জনসংহতি সমিতি আহ্বান জানাতে চায়– আসুন, দল-মত নির্বিশেষে স্বতন্ত্র আন্দোলন ও কর্মসূচিকে বিসর্জন দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের সকল শক্তিকে সুসংহত করি, জুম্ম জনগণের আন্দোলন, কর্মসূচি ও নেতৃত্বকে একমুখী ও একাট্টা করে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অধিকতর সুদৃঢ় করি।

মহান বিপ্লবী এম এন লারমার স্বপ্ন ও সংগ্রাম

॥ সজীব চাকমা ॥

১০ই নভেম্বর ২০১৫ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)-র ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৮৩ সালের এই দিনে বিভেদপন্থী, উপদলীয় চক্রান্তকারী, জুম্ম জাতির ইতিহাসের মীরজাফর গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের কাপুরুষোচিত ও চরম নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতামূলক হামলায় এক বীরোচিত ও মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুবরণ করেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবছর এই দিনে তিনি পুনরুজ্জীবিত হন, বুঝিয়ে দেন–তাঁর চেতনার ও তাঁর সংগ্রামের মৃত্যু নেই। যত দিন গড়িয়ে যাচ্ছে সমাজ প্রগতির প্রশ্নে ততই তাঁর স্বপ্ন ও সংগ্রামী জীবনাদর্শের অনিবার্যতা ও অপরিহার্যতা তীব্রভাবে অনুভব করছে মানুষ। মাত্র আড়াই দশকের সংগ্রামী জীবনে তিনি যে বহুমুখী, বহুমাত্রিক ও সুগভীর গুণাবলী ও অবদানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাতে তিনি চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে, অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আদিবাসী জনগণের উপর উগ্র বাঙালি জাত্যাভিমান চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে, দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে, জুম্ম জাতিসহ সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদাবোধের জাগরণে, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অর্জন তথা শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য তিনি একদিকে যেমন স্বায়ত্তশাসন, ভূমি অধিকার, স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয় প্রথা-পদ্ধতি ও ঐতিহ্যগত অধিকার এবং এ অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কথা ব্যক্ত করেছিলেন, তেমনি অপরদিকে জাতীয় অগ্রগতি ও বিকাশ সাধনের জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রায়নের আবশ্যকতার বিষয়টিও যথাযথভাবে উত্থাপন করেন।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য এম এন লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের একদল প্রতিনিধি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য রাজনৈতিক অধিকারের দাবি উত্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে তথা সংবিধানে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হয়। স্মারকলিপিতে উল্লিখিত দাবিসমূহ হল–

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য '১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির' ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

এর কিছু দিন পরে, ২৪ এপ্রিল ১৯৭২ আবারও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবি করে গণপরিষদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আহ্বায়ক হিসেবে এম এন লারমার স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পেশ করা হয়। এই আবেদনপত্রেও উক্ত চার দফা দাবিনামা পুনরায় উত্থাপন করা হয়। আবেদনপত্রে এম এন লারমা উল্লেখ করেন, 'স্মারকলিপিতে বর্ণিত "চারটি বিষয়" যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি, তজ্জন্য আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি। এককথায় বলতে গেলে "চারটি বিষয়" হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের চাবিকাঠি। নিজস্ব আইন পরিষদসহ একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিণত করার জন্য আমরা আমাদের দাবি উত্থাপন করছি।' ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে শিক্ষা নিয়ে আবেদনপত্রে এম এন লারমা আরও উল্লেখ করেন, 'জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা যথেষ্ট নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না।' সেই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কী ধরনের অধিকার দরকার তা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন–

ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই।

খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে এই রকম শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসনব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঘ) আমাদের জমিস্বত্ব–জুমচাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসনব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কেহ বসতি স্থাপন করতে না পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

উক্ত দাবির সমর্থনে এম এন লারমা আরও উল্লেখ করেছিলেন, 'আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত দাবি। বছরকে বছর ধরে ইহা অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই'। উক্ত দাবি ও বক্তব্যে একটা দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য তিনি একদিকে যেমন স্বায়ত্তশাসন, ভূমি অধিকার, স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয় প্রথা-পদ্ধতি ও ঐতিহ্যগত অধিকার এবং এ অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির কথা ব্যক্ত করেছিলেন, তেমনি অপরদিকে জাতীয় অগ্রগতি ও বিকাশ সাধনের জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রায়নের আবশ্যকতার বিষয়টিও যথাযথভাবে উত্থাপন করেন।

পরে ২ নভেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্কে সংবিধান-বিল বিবেচনার বিষয়ে আলোচনার সময়ও এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। এমনকি খসড়া সংবিধানের ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের পরে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব আনেন নিম্নোক্তভাবে–

"৪৭ অনুচ্ছেদের পরে নিম্নোক্ত নতুন অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হোকঃ

"৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে।"

পরবর্তীকালে এম এন লারমার এই দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক সরকারের নিকট ১৯৮৭ সালে পেশকৃত পাঁচদফা দাবিনামায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান ও নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা'র দাবি এবং ১৯৯২ সালে পেশকৃত সংশোধিত পাঁচদফা দাবিনামায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান এবং আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা'র দাবি সন্নিবেশ করা হয়।

এম এন লারমা চেয়েছিলেন, দেশের সংবিধানটি হবে যথার্থই জনগণের, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি চেয়েছিলেন, দেশের সকল পেশার, শ্রেণির মানুষের এবং সকল জাতির অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি। কিন্তু সেদিন সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য যে খসড়া সংবিধানটি উপস্থাপন করা হয় তাতে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপূর্ণতার কথা তুলে ধরেন। সংবিধানটির পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, '..আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। ..আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। তিনি আরও বলেন, '..আজকে যারা কল-কারখানার চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাঁদের রক্ত চুইয়ে আজকে আমাদের কাপড়, কাগজ, প্রতিটি জিনিস তৈরী হচ্ছে, সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের কথা এখানে নেই।'

এরপর তিনি দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা ও বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '..বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই।' তিনি আরও বলেন, 'বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা–পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিস্ময়।'

পরে সংসদ সদস্য আঃ রাজ্জাক ভূঁইয়া ৬ অনুচ্ছেদে নাগরিকত্বের উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে–

'৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' স্বভাবতই এবং সঙ্গত কারণে এম এন লারমা এই প্রস্তাবে আপত্তি তুলেন এবং নাগরিকত্বের সংজ্ঞাটির বিষয়ে ভালোভাবে বিবেচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন। এম এন লারমা তাঁর ঐতিহাসিক যুক্তি তুলে ধরে বলেন, 'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ–কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।'

নৃতাত্ত্বিক কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই, ভাষাগত-সংস্কৃতিগত-ইতিহাস-ঐতিহ্যগত কোন সাদৃশ্য নেই, তবুও সংখ্যাগরিষ্টতা ও গায়ের জোরে 'বাঙালি' পরিচয় চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা। বলাবাহুল্য, এম এন লারমার সেই যুক্তি সত্ত্বেও সেদিন

সংশোধনীটি পাশ হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে সেদিন এম এন লারমা গণপরিষদের অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন।

এম এন লারমা সেদিন যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসমূহের 'আত্মপরিচয়' ও অধিকারের স্বীকৃতির দাবি জানান, তা ছিল যেমনি যৌক্তিক, তেমনি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত। এম এন লারমার সেই দাবির পশ্চাতে বড় দুটি যৌক্তিক ভিত্তি হল–প্রথমত, এর ঐতিহাসিক ভিত্তি; দ্বিতীয়ত, মানুষ হিসেবের জুম্মদেরও রয়েছে স্বাধিকার বা স্বায়ত্তশাসনের সহজাত অধিকার। স্মরণাতীত কাল হতে জুম্ম জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে এবং তারাই এই পার্বত্য অঞ্চলে আদি বসতিস্থাপনকারী। তাদের জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদিও প্রধানত পাহাড় ও অরণ্যকে ঘিরেই আবর্তিত, যা বাঙালি জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা আজ কারো অবিদিত নয় যে, এ অঞ্চলে বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জুম্ম জনগণ এই অঞ্চলে স্বাধিকার নিয়ে প্রায় স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে। এ অঞ্চলে মাত্র দেশ বিভাগের সময়ও বিশেষত বাজার বা অফিস-আদালতকে কেন্দ্র করে বাঙালির উপস্থিতি ছিল নগণ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বিশেষ ঐতিহাসিক ও জনগোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যকে বৃটিশরা যেমনি স্বীকৃতি দেয়, পাকিস্তানও তা কমবেশী স্বীকার করে। এই ঐতিহাসিক ভিত্তি ছাড়াও মানুষ হিসেবে, মানবাধিকারের নীতি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও স্বাধীকার বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভের অধিকারী। দেশের অন্য সকলের ন্যায় জুম্ম জনগণও সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভের অধিকারী।

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮-এর অনুচ্ছেদ ঃ ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সকল মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমমর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাদের উচিত বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের অধিকার এবং ভ্রাতৃত্বের অধিকার মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করা।' অনুচ্ছেদ ঃ ১৫-তে উল্লেখ করা হয়েছে, '১. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তা লাভের অধিকার রয়েছে। ২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।' অপরদিকে বাংলাদেশের সংবিধানে কিছু বিতর্কিত বিষয় সন্নিবেশিত থাকলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো মানবাধিকার ঘোষণা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।' সংবিধানের 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'র 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' এছাড়া 'মৌলিক অধিকার' ভাগে 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য' অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' এবং 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের যে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও বিশেষত্ব, মানবাধিকারের যে ধারণা, দেশের সংবিধানের যে মূল স্পিরিট–সেই জায়গা থেকে বা নৈতিক ভিত্তি থেকে এবং আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের অধিকারসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল ও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এম এন লারমার যে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমেত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাওয়ার দাবি তা নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত। বলাবাহুল্য, এ অধিকার দেশের অপরাপর সংখ্যালঘু আদিবাসী জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, বিশ্বে উন্নত-স্বল্পোন্নত অনেক দেশ রয়েছে যে দেশে এমন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা নানা মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে থাকে।

সার্বজনীন মানবাধিকারের নীতিমালার ভিত্তিতে পরে ১৯৬৬ সালে মানবাধিকারকে আরও জোরালো করার লক্ষে 'আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি, ১৯৬৬' এবং 'আন্তর্জাতিক আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক চুক্তি, ১৯৬৬' নামে দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত দুই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশও অনুস্বাক্ষর করে। উপরোক্ত উভয় চুক্তির অনুচ্ছেদ ঃ ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, '১. সকল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে। এই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রয়াসী হয়।..' এছাড়া উভয় চুক্তির প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী, মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি, বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির বুনিয়াদ–এই বিবেচনায়, এই অধিকারগুলি ব্যক্তিমানুষের সহজাত মর্যাদা থেকে উদ্ভূত–এটা স্বীকার করে,..' ২০০৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিপুল ভোটে গৃহীত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং অবাধে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে।' আরও সুস্পষ্টভাবে অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চর্চার বেলায়, তাদের আভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসিত সরকারের অধিকার রয়েছে এবং তাদের স্বশাসনের কার্যাবলীর জন্য অর্থায়নের পন্থা ও উৎসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অধিকার রয়েছে।' বস্তুত সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু প্রত্যেক

জাতির জন্য, তার জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা এবং তার জাতীয় বিকাশ বা অগ্রগতি লাভের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অতীব জরুরী এবং আবশ্যকীয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের অধিকারও আদিবাসীদের মানবাধিকার। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্র তার দায়িত্ব থাকলেও যুগ যুগ ধরে এদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের সেই ন্যায্য অধিকার প্রদানে সম্পূর্ণভাবে নির্বিকার ও দায়িত্বহীন অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে।

বস্তুত বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতলের উভয় অঞ্চলের আদিবাসীদের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও দলিল, আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র, এমনকি বাংলাদেশ সংবিধানে যে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহ রয়েছে, সে অধিকার থেকে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কাগজে-কলমে সরকারসমূহ এসব অধিকারসমূহ অস্বীকার না করলেও বাস্তবে আদিবাসী জনপদকে এসব অধিকার থেকে রাখা হয়েছে বহু যোজন দূরে।

এখন পৃথিবীর দেশে দেশে আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার নিশ্চিত করার বা তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। জানা গেছে, ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানে আদিবাসীদের পরিচয়, জাতীয় অস্তিত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি ও অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স এর সূত্র অনুযায়ী, আমেরিকা, কানাডা, বলিভিয়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পাশাপাশি আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও টেরিটরির মালিকানার স্বীকৃতিও প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন দেশে আদিবাসীদের রক্ষার জন্য উচ্চতর আদালতের রায় ও নির্দেশনা আছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে আদিবাসীদের আইনগত অধিকার ও চুক্তি রয়েছে রাষ্ট্র ও আদিবাসীদের মধ্যে। মালয়েশিয়ার হাইকোর্ট আদিবাসীদের পূর্বপুরুষদের অধিকৃত ভূমি রক্ষার জন্য রায় দিয়েছিল ২০০২ সালে। ফিলিপাইনের আদিবাসীরা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত এবং তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য রয়েছে 'ইন্ডিজিনাস পিপল্‌স রাইটস এ্যাক্ট'। তাছাড়া আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কমিশন আছে ফিলিপাইনে। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও রাশিয়াতে আদিবাসীদের নিজস্ব পার্লামেন্ট আছে। এছাড়া এশিয়ার মধ্যে কম্বোডিয়া, ভারত, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, নেপাল, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, লাওস প্রভৃতি দেশে আদিবাসীরা হয় সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন ও পলিসি দ্বারা স্বীকৃত। ইন্দোনেশিয়ায় তৃতীয়বার সংবিধান সংশোধনের সময় সাংবিধানিকভাবে আর্টিক্যাল ১৮ আদিবাসীদের অস্তিত্বকে শুধু সম্মান প্রদর্শন করেনি, তাদের প্রথাগত অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

কিন্তু এদেশে স্বাধীনতার চার দশক পরও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে একদিকে আদিবাসীদের কাছে বর্তমানে অগ্রহণযোগ্য ও অবমাননাকর "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" ইত্যাদি অভিধা এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আবারও আদিবাসীদের 'বাঙালি' পরিচয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা 'আদিবাসী নয়' বা এদেশে 'আদিবাসী নেই' বলে জোরপূর্বক এক অবাস্তব ধারণা প্রচলন করার ষড়যন্ত্র চলছে। আর দিন দিন আদিবাসীদের স্বকীয়তা, ভূমি অধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে আদিবাসীদের পরিণত করা হচ্ছে নিজভূমে পরবাসী। আসলে বাঙালি শাসকগোষ্ঠী যতই ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসীদের বাঙালি হিসেবে পরিচিত করতে চায়, বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিতে চায়, যতই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা আদিবাসী নয়, এদেশে আদিবাসী নেই বলে চিৎকার করে, 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার না করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষকে অগণতান্ত্রিকভাবে নির্দেশ চাপিয়ে দেয়, ততই তীব্রভাবে এদেশের আদিবাসীদের বঞ্চনা ও বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানের কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

অনেক রক্ত, বহু মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা, অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক উপায়ে নিরসনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালে। এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কায়েমের যে স্বপ্ন ও দিক নির্দেশ করেছিলেন অনেকটা তারই আলোকে এই চুক্তির বিভিন্ন বিষয় বা ধারাসমূহ রচিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে প্রধানমন্ত্রী ইউনেস্কোর Houpet-Felix Boign শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ এই অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকারের সনদ। দীর্ঘ ১৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষ হিসেবে, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সরকার চুক্তিটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে যে নির্লিপ্ততা ও অবহেলা প্রদর্শন করে চলেছে–তা সরকার ও রাষ্ট্রের জন্য চরম লজ্জাজনক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধ্বজাধারী আওয়ামীলীগ সরকার, শান্তির জন্য পুরস্কার গ্রহণকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শান্তি ও উন্নয়নের পদযাত্রার দাবিদার এই রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকরা কি ভুলে গেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির জন্য, দীর্ঘ বঞ্চিত আদিবাসী জুম্মদের ঐতিহাসিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যে চুক্তি করেছেন সে চুক্তি সততার সাথে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রধানত তাদেরই দায়িত্ব?

পরিশেষে বলা যায়, আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করে ক্ষমতালোভী, উচ্চাভিলাষী ও অপরিণামদর্শী কুচক্রীরা জুম্ম জাতির যে অপরিসীম ক্ষতিসাধন করে গেছে এবং জুম্ম জাতির সংগ্রামের ইতিহাসে যে কলঙ্কময় ষড়যন্ত্রের অধ্যায় রচনা করে গেছে–সেই ইতিহাস ভুলে গেলেও চলবে না। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে ধ্বংস করার লক্ষে এবং জুম্ম জনগণের প্রগতির গতিধারাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য দ্রুত নিষ্পত্তির নামে, অতিশীঘ্রই জুম্ম জাতির মুক্তির রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে সেদিন ষড়যন্ত্রকারীরা যে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে গেছে–সেই ষড়যন্ত্রকারীদের ও ষড়যন্ত্রকে আমাদের যেমনি ঘৃণা করে যেতে হবে, তেমনি সেই ইতিহাসের শিক্ষাকে আমাদের বারবার পাঠ করে যেতে হবে।

জুম্ম জাতির স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

॥ পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য ॥

অল্পদিনের চেনা-জানার সুবাদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে যেমন দেখেছি ও জেনেছি তা আমার জন্যে এক পরম পাওয়া, এক দুর্লভ সৌভাগ্য। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে সতীর্থ হিসেবে এম এন লারমাকে পেয়েছি। সহপাঠীদের মধ্যে মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত এই তরুণ ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শাণিত যুক্তি সহযোগে তিনি বক্তব্য রাখতেন, মূল্যবোধ ও নীতির প্রতি ছিল অবিচল নিষ্ঠা। জীবন যাপনে ছিলেন অত্যন্ত সহজ ও অনাড়ম্বর। আমরা উভয়ে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলাম, রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল সাধারণভাবে অভিন্ন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে এম এন লারমার সেই রাতের দীর্ঘ আলোচনা ও সমঝোতা হওয়ার তারিখটি আজ মনে নেই কিন্তু মনে আছে এম এন লারমা সে রাতটি আমার সাথে কাটান। বর্তমান প্রেসক্লাবের বিপরীতে ন্যাপ কার্যালয় উশ্রী ভবনে ২১ তোপখানা রোডে দোতলার কোণার ছোট ঘরে আমি থাকতাম, মাটিতে ছিল ঢালাও পাতা বিছানা। সে ঘরে একজনের ভাত দুজনে ভাগ করে খেয়ে বিছানায় বসে শুয়ে ভোররাত পর্যন্ত পাহাড়ি জনগণ, দেশের মেহনতি মানুষের ভবিষ্যত, গণতন্ত্রের ভবিষ্যত, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের আশঙ্কা সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনার ঝড় তুলি। সে রাতের স্মৃতি ভোলার নয়।

সেই দিনগুলোতে পাহাড়ি জনগণসহ মেহনতি ও গরীব আপামর জনগণের শোষণমুক্তির স্বপ্নে তিনি অধীর থাকতেন। বিশ্বজুড়ে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সাফল্য, প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ ইউরোপ ও এশিয়ায় উত্তাল হয়ে ওঠা, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধিত বিশাল অগ্রগতি ও প্রভাব তাঁর চিন্তা ও ধ্যানধারনায় গভীরভাবে রেখাপাত করে। স্বদেশ চিন্তায় ছিল 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের প্রতি ঘোর অনাস্থা এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সমাজ রূপান্তরের রূপকল্প ছিল তার স্বপ্ন ও কল্পনা রাজ্য। তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতেন সামন্ত শোষণ-নির্যাতনের জোয়ালে আবদ্ধ পাহাড়ি জনগণের জিম্মিদশা দেখে। পাহাড়ি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অনুন্নয়ন, পিছিয়ে পড়া, অশিক্ষা, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও সদ্ভাবের অভাব তাকে পীড়িত করতো। উপরন্তু পাহাড়ি জুম্ম জাতিসমূহের উপর চেপে বসা পাকিস্তানী উগ্র সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শ ও শোষণ ব্যবস্থা এবং বাঙালি জাত্যাভিমানী ধারা এবং উগ্র ইসলামী আগ্রাসী কার্যক্রমের আঘাতে জুম্ম জাতির দুর্ভাগ্য বরণের পথে অবধারিতভাবে ধাবিত হওয়ার বহুমুখী চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন, সোচ্চার, সজাগ ও সতর্ক।

সেই সময়ে পাকিস্তান ঔপনিবেশিক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক গণবিরোধী সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি জুম্ম জাতিসত্তা নিশ্চিহ্নকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৬০ সনে এই মরণ ফাঁদ প্রকল্প চালু হয়। এ ঘটনাটি মারাত্মকভাবে নাড়া দেয় এম এন লারমার জীবনকে, এটি হয়ে উঠে তাঁর জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। এ সময়ে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তাঁকে তাড়া করে ফিরতে থাকে এক মহাবিপদের চিন্তা, জুম্ম জনগোষ্ঠীর শিকড় ছিন্ন এবং অস্তিত্ব বিপন্ন করা এবং জুম্ম সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিলুপ্ত করার এক 'রাষ্ট্রীয়' ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পাহাড়ি জনগণসহ দেশের আপামর জনগণকে সচেতন, সক্রিয় ও সংগঠিত করার কঠিন কর্মপন্থা তিনি গ্রহণ করেন। আইয়ুবের সামরিক শাসনের নির্যাতনের মুখে নাগরিক অধিকারহীন ঐ দিনগুলোতে এম এন লারমা অনেকটা একক প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর এই অসম সাহসী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্বের বিরোধীতা তিনি পেয়েছেন পদে পদে।

অকুতোভয় লারমা তৎকালীন পূর্ব বঙ্গের দু'টি প্রধান পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদের চিঠিপত্র কলামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার এই প্রকল্প বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আবেদন তুলে ধরেন এবং ঐ দু'টি পত্রিকায় এম এন লারমা স্বনামে প্রতিবাদী প্রবন্ধ লিখেন। আমার যতদুর মনে পড়ে কোলকাতার The Statesman পত্রিকায়ও এই মর্মে তাঁর লেখা ছাপানো হয়। উল্লেখ্য যে, তখন ভারতের The Statesman পত্রিকাটি এ অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারিত পত্রিকা ছিল। তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং আবেগদীপ্ত বিপন্ন মানবতা বাঁচানোর এ আহ্বানে পাহাড়ি অঞ্চলসহ প্রগতিশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং শাসকগোষ্ঠীর উন্নয়নের মুখোশ খসে পড়ে। এই বাঁধের কারণে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির সমতল ও চাষযোগ্য ৫৪ হাজার একর জমি, লারমার জন্মভিটা মহাপুরম গ্রাম, বৌদ্ধ বিহার, স্কুল, রাস্তাঘাট সবকিছু চিরদিনের জন্যে অতলে তলিয়ে গেলো। আশ্রয়হীন ও উদ্বাস্তুতে পরিণত হলো এক লক্ষ পাহাড়ি মানুষ।

এম এন লারমা এ ঘটনাকে পাহাড়িদের অস্তিত্ব বিলোপের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, জুম্ম জনগোষ্ঠীকে নিঃস্বকরণের 'প্রকল্প' এবং পাহাড়ের 'চিরন্তন কান্না' বলে চিহ্নিত করেন। অপর পক্ষে সামন্ত নেতারা এহেন প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া দূরের

কথা, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি উচ্চারণের সাহস দেখালেন না, উপরন্তু তারা বললেন 'কাপ্তাই বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের প্রতি পাকিস্তান সরকার প্রশংসনীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে'।

একদিকে পাক শাসকগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের পাহাড়ি জাতি বিনাশী এ সকল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শ নির্মাণের কাজে, জুম্ম যুব শক্তিকে জাতীয় অগ্রণী বাহিনী হিসেবে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষায় অগ্রসর করার কাজে, সকল শোষণ-নির্যাতন, অশিক্ষা, কুসংস্কার থেকে মুক্তির সামাজিক আন্দোলন গড়তে 'গ্রামে চলো' শ্লোগান নিয়ে গ্রামাঞ্চলে 'জাতীয় শিক্ষার' স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং যুব বাহিনীকে সর্ব পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এম এন লারমা।

এম এন লারমা ১৯৫৭ সনে পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন, '৫৮ সনে ছাত্র ইউনিয়নে অংশগ্রহণ এবং '৬২ সনে পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলনে নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং কাপ্তাই বাঁধ নিয়ে তার লেখালেখি এবং প্রচারপত্রের মাধ্যমে পাহাড়ি যুব মানসে তিনি প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। শাসকগোষ্ঠী এম এন লারমার এইরূপ ভূমিকায় বিপদ আঁচ করে ১৯৬৩ সনে ১০ ফেব্রুয়ারি তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তিন বছর লারমা কারারুদ্ধ থাকেন।

১৯৬৪ সনের মার্চ মাসে আমি চট্টগ্রামে কারারুদ্ধ হই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব বর্জন আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে। চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে তখন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সুখেন্দু দস্তিদার, সাইফউদ্দীন খান প্রমুখের সাথে কয়েক মাস আটক থাকি। সে সময় এম এন লারমাকে কারাগারের সাথী হিসেবে পাই। তখন দেখেছি কারাগারের কষ্টের জীবনকে পোড়-খাওয়া বিপ্লবীর জীবনে রূপান্তরিত করতে তিনি সাধনা করছেন, চরম কৃচ্ছ্রসাধনার পথ ধরেছেন। জুম্ম জাতির মুক্তি ও শোষিত জনগণের স্বার্থে সমাজ বদলের সংগ্রামের জন্যে তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন। ১৯৬৫ সনের ৮ মার্চ তিনি চট্টগ্রাম কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে শিক্ষকতা এবং রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। তাঁর আদর্শে ছাত্র-যুব-নারী উদ্বুদ্ধ হয়ে জুম্ম জনগণের মধ্যে গণজাগরণের প্রস্তুতি চালাতে থাকে।

১৯৭০ সনে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচন্ড জোয়ারের মধ্যেও এম এন লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এ সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এম এন লারমা জুম্ম যুব সমাজকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত করেন। কিন্তু স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সিভিল প্রশাসনের অসহযোগিতা ও বিরোধিতার কারণে এ উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে মুষ্টিমেয় রাজাকার ব্যতীত পাহাড়ি-বাঙালি ব্যাপকতম অংশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বন করেন। পরিস্থিতি এমন হয় যে, দখলদার পাক বাহিনী ও তার অনুচরদের হামলা-হুমকির কারণে এম এন লারমা ও তার ছোট ভাই সন্তু লারমাসহ অন্য নেতারা প্রায় সময় পালিয়ে বেড়াতেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ মুজিব বাহিনীর অত্যাচারে লারমা ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য জুম্ম নেতাদের প্রায়ই পালিয়ে থাকতে হয়।

এম এন লারমা আশা করেছিলেন বাঙালির জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা অর্জনের পর জুম্ম জনগণের অধিকারের আকাঙ্ক্ষা ও শত বছরের তাদের বেদনার কথা বিজয়ী বাঙালি শাসকগোষ্ঠী বুঝবেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাশা ও স্বপ্ন ছিল অনেক।

সংবিধান রচনাকালে এম এন লারমা তাঁর উচ্চ প্রত্যাশার কথা বার বার তুলে ধরেছেন। তিনি বলতেন, দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত ও শ্রেণিগত বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে এ অঞ্চলের এবং আদিবাসী পাহাড়ি জনগণের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন। সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাবে লারমার জুম্ম জাতীয়তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি অগ্রাহ্য করেন, স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব নাকচ করেন। কিন্তু লারমা দৃঢ়তার সাথে পাহাড়ি ১১টি জাতিগোষ্ঠীসহ ৪৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এবং জাতিসত্তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ এবং অবহেলিত জুম্ম জনগণের উন্নয়নের দাবি একদিনের জন্যেও ত্যাগ করেননি।

১৯৭২ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক হাতিয়ার গড়ে উঠে, গড়ে তোলা হয় ছাত্র, যুব, নারীসহ জুম্ম প্রগতিশীল অংশের সহযোগী সংগঠনসমূহ। ১৯৭৩ সনে সাধারণ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পার্বত্য উত্তরাঞ্চলে এম এন লারমা এবং দক্ষিণাঞ্চলে চাথোয়াই রোয়াজা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন।

জাতীয় সংসদেও এম এন লারমা পাহাড়ি জনগণের সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক অধিকার ও উচ্চতর স্থানীয় স্বশাসন এবং আদিবাসীসহ আপামর গরীব মেহনতি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ধারাবাহিক বক্তব্য, প্রস্তাব ও দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন।

১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব তাঁর দলের ব্যর্থতা ও জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে বাকশাল নামে একমাত্র পার্টি গঠনের জন্য যখন মরিয়া হয়ে উঠেন তখন তিনি আতাউর রহমান, মোঃ তোয়াহা এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বাকশালে যোগ দিতে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে এম এন লারমার এই বৈঠক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমার ক্ষুদ্র উদ্যোগ কিছুটা ছিল। এ বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সাথে এম এন লারমার দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক ও কার্যকর আলোচনা হয়। আলোচনায় বঙ্গবন্ধু পাহাড়ি জনগণের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভাষা-ঐতিহ্য রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার হিসেবে অনেকাংশে স্বশাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন এই শর্তে যে, এম এন লারমাকে বাকশালে যোগ দিতে হবে, অবশেষে লারমা

বঙ্গবন্ধুর এই শর্ত মেনে নেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে এম এন লারমার সেই রাতের দীর্ঘ আলোচনা ও সমঝোতা হওয়ার তারিখটি আজ মনে নেই কিন্তু মনে আছে এম এন লারমা সে রাতটি আমার সাথে কাটান। বর্তমান প্রেসক্লাবের বিপরীতে ন্যাপ কার্যালয় উশ্রী ভবনে ২১ তোপখানা রোডে দোতলার কোণার ছোট ঘরে আমি থাকতাম, মাটিতে ছিল ঢালাও পাতা বিছানা। সে ঘরে একজনের ভাত দুজনে ভাগ করে খেয়ে বিছানায় বসে শুয়ে ভোররাত পর্যন্ত পাহাড়ি জনগণ, দেশের মেহনতি মানুষের ভবিষ্যত, গণতন্ত্রের ভবিষ্যত, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের আশঙ্কা সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনার ঝড় তুলি। সে রাতের স্মৃতি ভোলার নয়। অত:পর ১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্টের মর্মান্তিক পটপরিবর্তনের পর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হলে জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনা করেন। সশস্ত্র এই দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে ১৯৭৭ ও '৮২ সনে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তিনি সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সনের ১০ নভেম্বর পানছড়ির গভীর অরণ্য আস্তানায় চিহ্নিত বিভেদপন্থী বিশ্বাসঘাতক চক্রের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন জুম্ম জাতির স্থপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ তাঁর ৮ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

এম এন লারমা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সামন্ত শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা। তাঁর ঠাকুরদা চানমনি চাকমা এবং পিতা চিত্ত কিশোর চাকমাসহ পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া সামন্ত বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য লারমার চেতনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। দেশের সংবিধানের অধীনে জুম্ম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় সরকারে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার এই সশস্ত্র যুদ্ধ এম এন লারমার নির্দেশিত পথে তাঁর মৃত্যুর পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সম্পাদনের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আনে। এ ক্ষেত্রে এম এন লারমার আদর্শের পতাকা হাতে নিয়ে বর্তমানে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। নানান চড়াই-উৎড়াই মোকাবেলা করে চরম ধৈর্য ও রাষ্ট্র নায়কোচিত দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন সন্তু লারমা। চেঙ্গী-মাইনী-কাচালং-সাঙ্গু-মাতামুহুরী-কর্ণফুলীর অববাহিকা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের অধিকার, জুম্ম পরিচয়, শান্তি ও উন্নয়ন ১৮ বছর পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরেও অর্জিত হয়নি। এখনও রক্ত ঝরে পাহাড়ে, অশান্তি-অবিচার অধিকারহীনতার মধ্যে পাহাড়ে কান্নার ধ্বনি উঠে। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণের জীবন দর্শন ও নীতি অনুসরণ করেই পাহাড়ে অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এম এন লারমার পথ নির্দেশ আজও প্রাসঙ্গিক- 'গ্রামে ছড়িয়ে পড়', 'শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো', 'নারীকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করো', 'সকল জাতির অধিকার সমান', 'যারা মরতে জানে তারা অজেয়' মহান নেতার এসব বাণী আজ সময় ও যুগের দাবি হয়ে আমাদের পথ দেখাবে।

এম এন লারমার পথ নির্দেশ আজও প্রাসঙ্গিক- 'গ্রামে ছড়িয়ে পড়', 'শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো', 'নারীকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করো', 'সকল জাতির অধিকার সমান', 'যারা মরতে জানে তারা অজেয়' মহান নেতার এসব বাণী আজ সময় ও যুগের দাবি হয়ে আমাদের পথ দেখাবে।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগ যুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

মানবেন্দ্র লারমা : আজীবন সংগ্রামী এক নেতা

॥ আব্দুল্লাহ সরকার ॥

পাহাড়ি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)-র সাথে আমার পরিচয় হয় বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে। ওই সংসদে তিনি ছিলেন পার্বত্য জনগণের প্রতিনিধি, আমি চাঁদপুরের। অসাধারণ সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তিনি। ফলে খুব দ্রুত আমাদের ওই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

লারমা শুধু পাহাড়ি নয়, সমতলের শোষিত মানুষদের সমস্যা নিয়েও ভাবতেন। এখানকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি বরাবরই তাঁর সমর্থন ছিল। একটা গভীর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁর এ দিকটাও আমাকেও ভীষণ আকর্ষণ করত।

এম এন লারমার সাথে বহু বিষয় নিয়ে আলাপ হত আমার। তবে ঘুরে-ফিরে পাহাড়ি জনগণের নানা সমস্যা ও সংকটের কথাই বেশি উঠে আসত তাঁর কথায়। পাহাড়ি জনগণের প্রতি অপরিসীম দরদ ও নিষ্ঠা ছিল তাঁর। পাহাড়ি জনগণকে তিনি বলতেন জুম্ম জনগণ। তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি খুব সজাগ ছিলেন। এসবের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ে বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাদের পূর্বসুরীদের মতই বার বার এব্যাপারে তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্যও তিনি বহুভাবে তৎকালীন সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তিনি খুব দুঃখের সাথে লক্ষ করেছেন, পাহাড়ি জনগণের ওই সব সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকেরা যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো, স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকেরাও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে। তারাও পাকিস্তানি প্রায়-ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলের দুর্দশাপীড়িত অসহায় উদ্বাস্তু মানুষদের ঢুকিয়ে পাহাড়িদেরকে সংখ্যালঘু বানানোর অপকৌশল নিয়ে এগুচ্ছে। এসব ঘটনা পাহাড়ি জনগণের মতো তাঁকেও ভীষণ হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে পাহাড়িদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি ভিন্ন পথে যেতে বাধ্য হন। এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাথে আমার বহু কথা হয়েছে, কখনো কখনো আমরা এ নিয়ে তর্কও করেছি। কিন্তু আমি সব সময়েই তাঁর মনের বেদনা বোঝার চেষ্টা করেছি। তাঁর এ বেদনা এখনও আমার বুকে বাজে।

একদল বিভ্রান্ত ব্যক্তির হাতে তাঁর মৃত্যুতে পাহাড়ি জনগণ হারিয়েছে তাদের নেতা ও বন্ধুকে। সারা জীবন তিনি জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রাম করেছেন। তাঁর মুত্যু প্রমাণ করেছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঐক্য কত প্রয়োজনীয়।

জনাব লারমা শুধু পাহাড়ি নয়, সমতলের শোষিত মানুষদের সমস্যা নিয়েও ভাবতেন। এখানকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি বরাবরই তাঁর সমর্থন ছিল। একটা গভীর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁর এ দিকটাও আমাকেও ভীষণ আকর্ষণ করত।

আমি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অনুসারী। এ দর্শনের শিক্ষানুসারে পাহাড়ি জনগণের সমস্যাকে আমি বাংলাদেশের অপরাপর শোষিত-নিপীড়িত জনগণের সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করি। বুর্জোয়া কাঠামো বহাল রেখে যেমন শোষিত জনগণের মুক্তি সম্ভব নয়, তেমনি এ কাঠামোর মধ্যে কোন নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। কারণ এক সময়ে বুর্জোয়ারা গণতন্ত্রের জয়গান গাইলেও আজকে তাদের কাছে তা জনগণকে প্রতারিত করার একটা কৌশল মাত্র। আমার বিশ্বাস, গত ৩৬ বছরের বুর্জোয়া শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে অন্য শোষিত মানুষদের পাশাপাশি নিপীড়িত পাহাড়ি জনগণও তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছেন। শাসকশ্রেণির চক্রান্তের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করা এবং নিজেদের দুর্বলতা দূর করা তাই আজ সমস্ত নিপীড়িত মানুষের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একদল বিভ্রান্ত ব্যক্তির হাতে তাঁর মৃত্যুতে পাহাড়ি জনগণ হারিয়েছে তাদের নেতা ও বন্ধুকে। সারা জীবন তিনি জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রাম করেছেন। তাঁর মুত্যু প্রমাণ করেছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঐক্য কত প্রয়োজনীয়।

আজীবন সংগ্রামী মানবেন্দ্র লারমার স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল।

[বি:দ্রঃ লেখাটি 'মাওরুম' সংকলন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিশেষ সংখ্যা, হিল রিসার্স ও প্রোটেকশন ফোরাম, নভেম্বর ২০০৭ থেকে নেয়া- তথ্য ও প্রচার বিভাগ]

এম এন লারমা সম্পর্কে আবদুল্লাহ সরকারের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন: আপনি এম এন লারমাকে কখন থেকে জানতেন?

উত্তর: আমি উনাকে জানতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার সময় থেকেই। এটা ১৯৬৪-৬৫ সালের দিকে। আর কর্মজীবনে এসে পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে। '৭৩ সালের নির্বাচনে উনিও স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়েছিলেন, পাহাড়ি জুম্ম-জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে। আর আমি চাঁদপুর-হাইমচর নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম।

প্রশ্ন: এই যোগাযোগটা কোন বছর হয়?

উত্তর: যখন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসে, সেই অধিবেশনের আগের দিন, এমপি হোস্টেলে উনি হঠাৎ করে সন্ধ্যায় রাতে আটটার দিকে আমার রুমে আসেন। রুমে এসে হেসে হ্যান্ডসেক করে বললেন, সরকারদা, পরিচিত হতে আসলাম। আমি বললাম, আমিও আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

তখন নাখালপাড়ায় ছিলো এমপি হোস্টেল। সেখানে দুজনে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে শেষ পর্যন্ত বললাম যে, দেখেন আমরা সাধারণ স্বতন্ত্র সদস্য হলেও আমাদের কিন্তু দায়িত্ব অনেক বেশী, সমগ্র জাতি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কারণ সেখানে আওয়ামী লীগেরই হলো তিনশ পঁচিশজন সদস্য (সংরক্ষিত আসনসহ)। আমরা মাত্র ৮ জন ছিলাম বিরোধী দল। ফলে সেখানে যেমন জনগণের পক্ষে কথা বলার খুব বেশী সুযোগ ছিল না, আর কথা বলার চেষ্টা করলেও তরুণ আওয়ামী লীগার এমপিরা এত ঝামেলা করতো, হৈ চৈ করে টেবিল চাপড়াতো, যাতে আমাদের কথা শোনা না যায়। এই রকমভাবে আমাদেরকে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করতো। পরে আমরা দুজনে বসলাম, বসে ভাবলাম, না What may come, we must be vocal in the parliament. আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমরা জাতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদর্শের ব্যাপারে আমাদের বিবেকে আমরা যতটুকু সঠিক মনে করি We must say in the parliament. জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হবার আগের দিন সন্ধ্যায়, এমপি হোস্টেলে, এ আলাপ হয়েছিলো।

প্রশ্ন: কিন্তু এই অধিবেশন শুরু হবার আগে অন্য কেউ যারা ছিলো, আওয়ামী লীগের বাইরে সেদিনের সেই বৈঠকে আর কোন স্বতন্ত্র নেতা কি উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর: না, প্রথম অন্যদের সাথে হয়নি। ওই বৈঠকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ঠিক আছে; অন্যদের সাথেও আমাদের যোগাযোগ করা দরকার। তখন আমি লারমা বাবুর উপস্থিতিতেই আতাউর রহমান খান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলাম।

প্রশ্ন: আওয়ামী লীগের বাইরে স্বতন্ত্র এবং অন্য দলের কে কে ছিলেন?

উত্তর: আতাউর রহমান খান, শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, শ্রী চাই থোয়াই রোয়াজা, জনাব মো: আব্দুস ছাত্তার, জনাব ময়নুদ্দিন আহমেদ মানিক, সৈয়দ কামরুল ইসলাম, মহম্মদ সালেহ উদ্দিন, জনাব মো: আব্দুল হাই।

প্রশ্ন: জাসদের এমপিও ছিলেন আপনি বলেছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ, জাসদের দুইজন ছিলেন। এই অবস্থাতে তখন সেই সময় আমরা ভাবলাম যে, না আমরা আমাদের বক্তব্য অবশ্যই সংসদে তুলে ধরব। ওই চিল্লাচিল্লির ভিতরে, স্পিকার যদি টাইম না দিতে চায়, এই সমস্ত সবকিছু মোকাবেলা করেই, কার্যবিধি প্রণালীর যে নিয়ম আছে যে, সংসদ কিভাবে চলবে, সেই কার্যবিধি প্রণালীটা দুইজনে বসে বিভিন্ন পয়েন্টগুলি আলাপ-আলোচনা করলাম। আলাপ আলোচনা করার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম We will personaly meet the speaker.

প্রশ্ন: তখন স্পিকার কে ছিলেন?

উত্তর: সৈয়দ মহম্মদ আলী সাহেব। তারপর আমরা দুইজনে স্পিকারের সাথে গিয়ে দেখা করলাম। দেখা করে বললাম- দেখেন The moment you are elected speaker, that very moment you are an independent person. আপনি সকলের, এখন শুধু আওয়ামী লীগের, মেজরোটি এমপিদের না। আমরা আরো আটজন বাইরের এমপি আছি, তাদেরও আপনি অভিভাবক। ফলে আমরা যাতে আমাদের কথা বলার সুযোগ পাই সেইটা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। আমরা আশা করব আপনি নিরপেক্ষভাবে আমাদের কথা বলার সুযোগ দেবেন। হ্যাঁ, আমরা যদি দেশ, জাতি, মানুষের-সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য বলি সেটা আপনি প্রয়োজনবোধে এক্সপাঞ্জ করে দেবেন, এইটা নিয়ম আছে। অথবা কৈফিয়ত চাইতে পারবেন আমাদের কাছে...। কিন্তু আমাদেরকে বলতে দিতে হবে, এইটা আমাদের রাইট, জনগণ আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত যদি করেন তাহলে আমরা বাধ্য হব সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জাতির সামনে এই পার্লামেন্টের চরিত্র তুলে ধরতে।

প্রশ্ন: পার্লামেন্টের কারণেই কি মানবেন্দ্র লারমার সাথে যোগাযোগটা হয়েছিলো আপনার? নাকি পার্লামেন্টের বাইরেও যোগাযোগ ছিলো?

উত্তর: না, পার্লামেন্টের বাইরে হলো সক্রিয় যোগাযোগের সূত্রপাত, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই পার্লামেন্টের বাইরেও আমরা যখন যেখানে যাই যেমন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলে অবশ্যই

তাঁর সাথে দেখা করব।

প্রশ্নঃ আপনার তখন চট্টগ্রামে যাওয়া হয়েছিলো?

উত্তরঃ হ্যাঁ, যাওয়া হয়েছিলো... তারপরে আমি বিভিন্ন প্রস্তাবও দিয়েছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ তারপরে.. কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী এই সমস্ত জায়গায় যদি উনি সময় দিতে পারেন... Time to time, আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করব। সিদ্ধান্ত একটা হয়েছিলো... কিন্তু আসলে তখন প্রচন্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিলো, ফলে সেই সময় আর এই প্রোগ্রামগুলোর জন্য খুব একটা সময় বের করা যায়নি।

প্রশ্নঃ আপনারা দু'জনেই অংশগ্রহণ করতেন? না কি অন্য দলের এমপিওরা?

উত্তরঃ আতাউর রহমান সাহেব সিনিয়র মানুষ উনি কোথাও যেতেন না, শুধু যেতেনই না, দুর্ভাগ্যজনক উনি কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে সরকারের সমালোচনায়ও অংশগ্রহণ করতেন না।

যেমন চতুর্থ সংশোধনী যেদিন পাশ হয়। এটা তো একটা কালো আইন, কুখ্যাত কালো আইন। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে একটা কলঙ্কজনক পদক্ষেপ এই চতুর্থ সংশোধনী। চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়েছে, যেদিন থেকে চতুর্থ সংশোধনী কার্যকরী হবে, সেদিন থেকে সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে– বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ সংক্ষেপে বাকশাল। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র বিরোধীতা করি। '৭৩ সালটা ছিলো আওয়ামী লীগের জন্য একটা সোনালী যুগ। মুক্তিযুদ্ধের পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা ক্ষমতায় আসে, ওভারহোয়েলমিং মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় আসে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে।

সেরকম একটি পরিবেশে সংসদে বক্তব্য রাখা খুব কঠিন বিষয় ছিলো। আমরা আলাপ আলোচনা করে ঠিক করলাম পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন We are to face it. এবং আমরা জাতির বিবেক হিসেবে পার্লামেন্টে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব। প্রধানত আমরা দুজনই এই আলোচনাটা করি, তারপরে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচন বিষয়ে আমরা বসি, আতাউর রহমান সাহেবকে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত করি। আতাউর রহমান খান সাহেব কখনই কোন উদ্যোগ নিতেন না। বহু চেষ্টা তদবির করেছি আমি, তাঁর বাসায় পর্যন্ত গিয়েছি, তাঁকে অনুরোধ করলাম। বিশেষ করে এই চতুর্থ সংশোধনী পাশ হবার দিনটাতে আমি মানসিকভাবে খুবই কষ্ট পেয়েছি। আমি তার আগের দিন নাখালপাড়া এমপি হোস্টেলে। আমার এলাকার একটা শ্রমিক, যে বিজি প্রেসে কাজ করতো যেখান থেকে সংসদের কার্যবিবরণী ছাপা হতো। তিনি আমার রুমে ঢুকেই সার্ট খুলে গেঞ্জিটা খুলছেন! আমি গেছি ভয় পেয়ে, যে কি ব্যাপার উনি সার্ট খুলছেন কেনো, আক্রমণ-টাক্রমণ করবেন নাকি আমাকে! পরে গেঞ্জিটা খুলেই বলেন, স্যার দেখেন তো এইটা কি লেখা? আমি দেখি কি দি ফোর্থ এ্যামেন্ডমেন্ট অব কনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ!

প্রশ্নঃ ওইটা ছাপা হচ্ছিল সেদিন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ওই হেডিংটা গেঞ্জির মধ্যে ছাপ দিয়ে তিনি নিয়ে আসেন। তাদের দুইদিন যাবত আটকিয়ে রেখে সেখানে এই চতুর্থ সংশোধনী-এর সমস্ত কাজকর্ম করিয়েছে, বের হতে দেয় নাই। এতেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে, যে সারা বছর কাজ করি পার্লামেন্টের সকাল দশটা-চারটা আসি যাই কোন বাঁধা নাই, আজ তিনদিন যাবত আমাদেরকে আটকিয়ে রেখেছে, বের হতে দেয় না। তারপরে এই সমস্ত কী কী কাজ করে....। তা কী কাজ, সরকার সাহেবের কাছে গেলে বুঝতে পারবো।

তখন আমি বুঝে গেছি, আগামী দিনেই সংসদে বিষয়টা উঠছে। সাথে সাথে আতাউর রহমান সাহেবকে আমি ফোন করলাম, আতাউর রহমান সাহেব বললেন, বাবা, আমার তো শরীর-টরীর ভালো না, আমি আর এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারবো না।... এইটা অধিবেশনের আগে আমরা দুইজনে আলাপ করে নেব। কিন্তু সময়মত তিনি আলাপ করতে কোন উৎসাহ দেখালেন না। সংসদে গেলাম, আলাপ-আলোচনা করতে চাইলাম। এই ব্যাপারে কী মতামত ওনার, উনি কোন কথা বললেন না।

সংসদে একটা বিল পাশ হলে নিয়মটা হলো আগের দিন সংসদে একটা কপি দেয়া, পরের দিন বিকালে হোক, সকালে হোক, যখন পার্লামেন্ট বসে তখন সেইটা ফাষ্ট রিডিং হোক আর সেকেন্ড রিডিং হোক স্পিকার সেটা আলাপ আলোচনা করেন। চতুর্থ সংশোধনী বিল যখন উত্থাপিত হচ্ছিল, উত্থাপন করার প্রস্তাব যখন স্পিকার দিচ্ছিলেন, তখন আমি বিরোধিতা করেছি। জরুরী অবস্থা ছিলো। স্পিকার বলেন যে, না এটা বিল...। আমি বললাম এটা অসম্ভব। সংসদের ভেতরেই কি আপনি জরুরী আইন জারী করছেন? এটাই হলো সংসদের বাইরে, সংসদের ভিতরে কোন জরুরী আইন নাই, ফলে আমাকে কথা বলতে আপনাকে দিতেই হবে।

প্রশ্নঃ যখন তোলা হলো, তখন অন্য যে আটজন... মানবেন্দ্র লারমা তারাও কি আলোচনা করতে চাইছিলেন?

উত্তরঃ তখন পরিবেশটা এমন ছিলো আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সব জায়গায় নির্বাচিত। দলে দলে হাজার হাজার লোক মিছিল করে শেখ সাহেবের ৩২ নম্বরের ধানমন্ডির বাসভবনে গিয়ে বাকশালে যোগদান করছিল, মানে পরিবেশটাই ছিলো এমন ঘোলাটে, উত্তপ্ত, ভীতিকর। যে এর বিরুদ্ধে কোন কথা যে কোন লোক বলার সাহস পায় নাই। আতাউর রহমান সাহেবের মতো মানুষ কথা বলতে সাহস পান নাই, মশিউর রহমান, যাদুমিয়ার মতো মানুষ কথা বলতে সাহস পান নাই। ঝানু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা ভাসানী একমাত্র কথা বলার চেষ্টা করেছেন, তাও ভাসানীকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে দিয়েছিলো কয়েক ঘন্টা...।

আমরা লারমা বাবুর সাথেও আলোচনা করেছি।

প্রশ্নঃ এটা কি বাকশালে জয়েন করার আগে?

উত্তরঃ না। তার আগেই আলোচনা করেছি। যখন একদলীয় শাসনব্যবস্থা হবে হবে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে, তারপরে ওই দিন রাতেই আমি আলাপ আলোচনা করেছি। দেখেন আমাদেরকে এটা বিরোধিতা করতেই হবে। এইটা একটা ফ্যাসিষ্ট কালো

আইন। এই কালো আইন আমরা মেনে নিতে পারি না। তারপরে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে এই কালে আইন পাশ হয়ে গেল।... কিন্তু আমরা আমাদের বক্তব্যটা রেকর্ড করে রাখবো পার্লামেন্টে। প্রয়োজনে আমরা পরবর্তী সময়ে দেশবাসীর সামনে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সামনে, আমরা আমাদের এই মতামত জনগণের সামনে তুলে ধরবো। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ যে অঙ্গীকারের ভিত্তিতে হয়েছিলো, '৭৩ এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ জনগণের সাথে দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়ে তাদের দলীয় ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে তারা এই বাকশাল করছিলো। এটা একটা কালোআইন, এই কালোআইন দেশের গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি স্বরূপ, বাধা স্বরূপ।

প্রশ্নঃ মানবেন্দ্র লারমাকে, বাকশালে নেয়ার জন্য...

উত্তরঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, বিষয়টা উনি বুঝেছেন তারপরে শেষে আমার কাছে যখন মতামত চেয়েছেন তখন আমি বলেছি, আপনি একটা নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের জনগণের প্রতিনিধি, তাদের সমস্যা ভিন্নতর, তাদের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। বিচ্ছিন্নভাবে আপনার সেই সমস্যার সমাধান দেওয়া আমি মনে করি সম্ভব হবে না। ফলে আপনি প্রথম থেকে যেটা করবেন, সেটা হলো জুম্ম জনগণকে সংগঠিত করেন, They are un-organised people, তাদের অর্গানাইজ করেন। তারা যে আদিবাসী এই প্রশ্ন নিয়ে তখন বিতর্ক করা শুরু করছিলো আওয়ামী লীগ। আপনারা এই পয়েন্ট থেকে সরবেন না। বাস্তবিকই আপনারা আদিবাসী এই এলাকায়।... বিষয়টি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেছি, উনি নিজে বলেছেন যে, 'তোমরা ঘাবড়িও না, পাহাড়ি জনগণকে, জুম্ম জনগণকে মাইনরিটি করে দেব। আমি বললাম যে, 'আপনি কি বললেন? আপনার মত একজন জাতীয় নেতার এই জাতীয় বক্তব্য আমি তীব্র নিন্দা জানাই। উনি বললেন, কেন বাঙালি সেখানে ঢুকতে পারবে না? আমি বলি, ঢুকতে পারবে না আমি বলি নাই, কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখানে যাওয়া, আর আপনি নিজে সেখানে তাদেরকে পুশ করা, সরকারের রেশন দিয়ে, তারপরে বাড়িঘর করার জন্য টাকা দিয়ে, দু'টো আলাদা বিষয়? নদী ভাঙ্গনের শিকার আমার এলাকার বহু লোক সেখানে গেছে। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, দীঘিনালা এই সমস্ত এলাকায় গিয়ে আমি তাদের পেয়েছি।

প্রশ্নঃ এই যে আপনি বললেন, বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনি আলাপ করেছিলেন এটা কোন বছর?

উত্তরঃ এটা ধরুন '৭৩ সালের মাঝামাঝির দিকে হবে এক সময়। পার্লামেন্টের বক্তব্যের পরে উনি আমাকে ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে। আমি গেলাম, সেসময় এই সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছিল। তখন উনি বলেন যে, 'আমি ওদের মাইনরিটি করে দেব। তোমার এলাকাও তো নদী ভাঙ্গা এলাকা। তোমার এলাকা থেকে তালিকা দাও, আমি ওদেরকে সেখানে সরকারীভাবে বসতি করে দেব।' আমি বললাম, অসম্ভব। এই প্রক্রিয়া একটা ফ্যাসিস্ট প্রক্রিয়া, এটা অগণতান্ত্রিক এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী। এইভাবে পাকিস্তান ওয়ালারা একবার ভেবেছিলো ঢাকাতে বাঙালিদের মাইনরিটি করে দিবে। মিরপুর, মোহম্মদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় বিহারীদের বসতি প্রদান করে। তাতে উল্টো ফল হয়েছে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন হয়তো হতো ঠিকই, কিন্তু আমার ধারনা হয়তো আরো কিছুদিন দেরী হতো। বিহারীদের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন জনগণের যখন চোখে পড়লো, তখন দ্রুত জনগণের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

প্রশ্নঃ '৭৫-এর পরে মানবেন্দ্র লারমারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ছেড়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেলেন। এটা নিয়ে আপনারা যখন সাক্ষাৎ করতেন ওই পার্লামেন্টে, তখন কি কোন আলাপ হতো?

উত্তরঃ অবশ্যই আলাপ হয়েছে, রাজনীতির আলাপ যখন করেছি, করার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকার চতুর্থ সংশোধনী নিয়ে এসে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে বন্ধ করে দিয়ে যখন একটিমাত্র রাজনৈতিক দল– বাকশাল নাম দিয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করলো। তখনই আমরা বুঝেছি যে, এখানে হিটলারের মতো একটা ফ্যাসিজম কায়েম হতে যাচ্ছে বাকশালের নামে। এই জন্যই আমি বলেছি, এই বাকশালে আমি যোগদান করবোই না।

বাকশালে যোগদান করার জন্য আমাদেরকে পার্লামেন্টে স্পিকার নির্দিষ্ট একটা টাইম দিয়েছিলেন, আইনটা পাশ হওয়ার পরে একমাসের মধ্যে যোগদান করার সীমা বেঁধে দেয়া ছিলো, বলা হয়েছিলো যে এই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যে সংসদ সদস্য বা সদস্যরা যোগদান করবেন না বাকশালে, তাদের সংসদ সদস্য পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। এটা বলার পরেও আমি যোগদান করি নাই। আমি মানবেন্দ্র লারমাকে বলেছি, 'আপনি ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখেন। আপনার এলাকার জনগণ আমার সমতল অঞ্চলের মতো না, আপনি নির্দিষ্ট এলাকার। আপনার এলাকার বিশেষ কিছু সমস্যা আছে, সেটা সরকারকে দিয়ে করাবেন কিনা? জনগণের সাথে মতবিনিময় করেন। তারপর তাদের সাথে পরামর্শ অনুসারে আপনি সিদ্ধান্ত নেন। আর যখন গণতান্ত্রিক রাজনীতি বন্ধ হয়ে গেলো, এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো যে রাজনীতিতে অস্ত্র আপনাআপনি চলে আসবে। স্রোতের পানি যখন স্বাভাবিক গতিতে বাঁধা পায়, তখন ভিন্ন পথ খুঁজে নেয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতি হচ্ছে তাই। গণতান্ত্রিক রাজনীতি করার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে তখন সেটা সশস্ত্রভাবে শক্তি সঞ্চয় করে হলেও সেই রাজনীতির দিকে মানুষ ধাবিত হয়। সেটা আপনি আপনার এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি জনগণের সাথে বুদ্ধি বিবেচনা করে কখন কী করবেন দ্যাট ইজ আপ টু ইউ।'

প্রশ্নঃ সর্বশেষ কবে যোগাযোগ হয় আপনার?

উত্তরঃ সর্বশেষ '৭৫ সালের পরে, শেখ মুজিব মারা যাওয়ার পরে আর সরাসরি আমার সাথে দেখা হয় নাই।

প্রশ্নঃ তারপর তো উনি বাকশালে যোগদান করলেন? তারপর কি আর যোগাযোগ হয়নি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তিনি বাকশালে যোগদান করলেন। রাজনীতির কারণে তিনি বাকশালে যোগদান করলেন। আমি এটা চাইছিলাম না। তারপর তার এলাকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ পরিস্থিতিতে আমি তো সেই দায়িত্ব নিতে পারি না।

প্রশ্নঃ সরকার ভাই এই জায়গাটা একটু বলতে হবে।

উত্তরঃ লারমা বাবু যখন তার বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বাকশালে যোগদান করেছেন। আমার যোগাযোগ করার প্রশ্ন উঠে না। তার কারণ আমি বাকশালের তীব্র বিরোধীতা করেছি। আমি বাকশালের বিরোধীতা করার কারণে, বাকশালে যোগদান করার সময়সূচি পার হয়ে যাওয়ার পরের দিন থেকেই আমার বিরুদ্ধে দেখামাত্র গুলি করা, জীবিত অথবা মৃত গ্রেফতার করার আদেশ রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ, বিডিআরকে দেয়া হয়েছিলো। ফলে তখন আমি আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছি। সেই আত্মগোপন থাকা অবস্থায় একবার আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম, আমার এক ফুফাতো বোনের স্বামী ডাক্তার, মেজর ছিলো; তার বাসায় আত্মগোপন করেছিলাম। সে আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম দেখার আমার খুব সখ। তাই সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার বোন চাকরির খাতিরে তার স্বামী যেতে দিতে রাজী হলেও আমাকে যেতে দিতে চাচ্ছিলো না। কারণ সেখানে শান্তিবাহিনী আছে। আমি বললাম, শান্তিবাহিনী আমাকে কিছু করবে না। আপনি ভয় পাবেন না, অন্য সমস্যা হলে ভিন্ন ব্যাপার। তারপরে আমি ওনার সাথে গেলাম।

প্রশ্নঃ এটা কত সালে?

উত্তরঃ চুয়াত্তর সালের শেষের দিকে হবে, তারিখটা মনে নেই আমার। এরপরে আমি গেলাম, যেখানে ছোটহরিণা নামে একটা বাজার আছে। সেখানে একটা বিডিআর ক্যাম্প আছে। আমরা ছোটহরিণা থেকে ঠেগারমুখ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কেউ না ঠেকলে নাকি ঠেগারমুখে যায় না, ওই এলাকার মানুষেই বলে। এত দুর্গম পাহাড়ি জায়গা যে ধারণ করা কষ্টকর। গাছের নৌকা দিয়া ছোটহরিণা থেকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। আমি ক্যাম্প থেকে বাজারের দিকে একটু এলাম, আসার পরে বাজারের মাঝখানে দেখি কতগুলো লোক জড়ো হয়ে গ্রুপে গ্রুপে কী জানি আলাপ আলোচনা করছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো, যে এদের মধ্যে আমি তিন-চারজনকে চিনি। ওরা আমাকে দেখে দৌঁড়ে আমার কাছে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো, স্যার আপনি এখানে? আমি হেসে বললাম, কেন আমার কি এইখানে আসা নিষেধ আছে নাকি? ওরা বললো, না কেন আসছেন, কিভাবে আসছেন? আমি বললাম, আমার এক দুলাভাই আছে, আমি বেড়াতে আসি তার বাসায়, সে বিডিআরের ডাক্তার, মেজর। তার সাথে আমি আসছি ঠেগারমুখ দেখতে।

প্রশ্নঃ এরা কারা?

উত্তরঃ এরা হলো পাহাড়ি জনগণের বিশিষ্ট লোক। এদের মধ্যে তিনজনকে আমি লারমা বাবুর অনুরোধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে জামিন নিয়ে দিয়েছিলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের সংগঠন ছিলো জনসংহতি সমিতি। এই হিসেবে লারমা বাবু আমাকে বলেছিলেন, 'দেখেন তো- আমার কথায় তো আর কাজ হলো না। আপনি যদি বলে জামিনের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারেন; ছেলেগুলি একেবারেই নির্দোষ।'

চুয়াত্তরের শেষের দিকে হবে আমার ধারণা। তারপরে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলাপ করলাম, টেলিফোনে আলাপ করে বললাম, এই মুহূর্তে আপনাকে অর্ডার দিতে হবে, এই চারজনের জামিনের জন্য। আমার জামিনে এই চারজনকে আপনি থানা থেকে রিলিজ করেন, যদি কোন সমস্যা হয়, যখন যেখানে যে অবস্থায় হাজির করতে বলবেন আমি দায়িত্ব নিলাম, তাদের আমি হাজির করে দেব। আর আমি যদি হাজির করতে না পারি, তাহলে আমাকেই আপনারা এ্যারেষ্ট করে শাস্তি দিতে পারবেন কোন অসুবিধা নাই। তখন তিনি বললেন, 'না না আপনি যখন বলছেন, আমি অবশ্যই এদের জামিনের ব্যবস্থা করবো। আমি এখনই টেলিফোন করে দিচ্ছি।' ওরা রিলিজ হয়ে গেলো।

তাদের মধ্য থেকে তিন-চারজন ওখানে ছিলো। এরপরে আমি যখন গেলাম, ওদের ডাকলাম। ওরা আসলো। আসার পরে তারা বললো, আমার জন্য নাকি তাদের পরিকল্পনা সব ভেস্তে গেলো। কেন জিজ্ঞাসা করাতে তারপরে বললো যে, তাদের চারজন নেতাকে সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। ওদের জন্য তারা মেজর সাবকে অপহরণ করবে ভাবছিলো। অপহরণ করে তাকে জিম্মি করে রেখে তাদের নেতাদের সাথে বন্দী বিনিময় করবে- এমন পরিকল্পনা ছিলো তাদের। যার জন্য তারা গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিল। কিন্তু আমি সেখানে থাকায় আমার দুলাভাই মেজর সাবকে আমার সামনে থেকে নিয়ে কিভাবে নিয়ে যাবে এটা তাদের বিবেকে বাঁধছিল। আমি তাদেরকে বললাম, ঠিক আছে তোমাদের বিবেকে বাঁধুক, আমারও বিবেকে বাঁধে। আমার দুলাভাই তোমাদের নির্যাতনের কাজে সহযোগিতা করবে এটাই তো হতে পারে না। তাহলে আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। আমি দেখি আমাকে দশ মিনিট সময় দাও, আমি গিয়ে দুলাভাইকে বললাম ব্যাপারটা। আমি বললাম এই মুহূর্তে আপনি টেলিফোন করে ওদের রিলিজ করিয়ে দিবেন, আর না হলে এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে সরে গেলাম। আপনার চিন্তা আপনি করেন।

দুলাভাই বললেন তিনি চট্টগ্রামে টেলিফোন করছেন। আমি তাকে বললাম, চট্টগ্রাম থেকে খবর আসতে আসতে তোমাকে কোথায় গায়েব করে দিবে, তুমি ভাবতে পারছো? এই যে লোকগুলি দেখছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছেই শর্ট আর্মস আছে বলে একটু ভয় দেখালাম। তাই চট্টগ্রাম লাইনে না গিয়ে সরাসরি কম্প্রোমাইজের লাইনে যান। তখন সে টেলিফোন করে বিষয়টি মীমাংসা করে দিলো। তারপর আমরা রাতে থেকে গেলাম সেখানে। তারপর দিন তারা একটা ছোট লঞ্চে আমাদেরকে তুলে দিলো। আমার একজনের নাম মনে আছে, সে মেম্বার। নাম হলো ভগবান মেম্বর। সে সকাল বেলা লঞ্চে তোলার আগে দেখি ঝুড়িভর্তি আনারস, বিশাল বিশাল দুই রুইমাছ, কাতাল মাছ তারপরে আরও ফলফলাদি নিয়া আসছে। এসে লঞ্চে তুলে দিলো।

প্রশ্নঃ সরকার ভাই, মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যুর খবরটা আপনি কিভাবে পান?

উত্তরঃ মৃত্যুর সংবাদটা পরবর্তী সময়ে খুব সম্ভবত আমি খবরের কগেজের মাধ্যমেই পেয়েছি, খবরের কাগজের মাধ্যমে এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাধ্যমে।

প্রশ্নঃ মৃত্যুর খবরে আপনার কী মনে হয়েছিলো, মানে.....

উত্তরঃ তাঁর মৃত্যুটা ছিলো একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন।

[বিঃদ্রঃ আবদুল্লাহ সরকারের এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছে "আবদুল্লাহ সরকার স্মারকগ্রন্থ" থেকে, কমরেড আবদুল্লাহ সরকার স্মৃতি সংসদ, আগস্ট ২০১৪। মূল স্বাক্ষাৎকারটি কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত।]

নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণ

॥ ড. কামাল হোসেন ॥

[মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র স্মৃতি, একই সাথে জাতীয় সংসদে দায়িত্বপালন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংবিধান প্রণেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের কাছ থেকে এই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন 'মাওরুম'-এর সম্পাদক দীপায়ন খীসা। এই সাক্ষাৎকারটি হিল রিসার্স ও প্রোটেকশন ফোরামের নভেম্বর ২০০৭ প্রকাশিত 'মাওরুম' মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়। বহুল প্রচারের জন্য এই সাক্ষাৎকার পুন:মুদ্রণ করা হলো– তথ্য ও প্রচার বিভাগ।]

স্বাধীনতার পর গণ-পরিষদ সদস্য এবং দেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং ড. কামাল হোসেন দায়িত্ব পালন করেছেন। সংসদ সদস্য হিসেবে তৎসময়ে তাঁদের একটা যোগাযোগ ছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সঙ্গে নিজস্ব স্মৃতি প্রসঙ্গে ড. কামাল বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে যখন আমি দেখেছি তখন তাকে তরুণ মনে হতো। আমরা গণপরিষদ এবং পরে জাতীয় সংসদে পাশাপাশি বসতাম। সংসদে তিনি পাহাড়ি জনগণের পক্ষে সোচ্চার কথাবার্তা বলতেন। তিনি বলতেন, আপনারা বাঙালিরা সংগ্রাম করে অধিকার পেয়েছেন। পাহাড়িদেরও আকাঙ্ক্ষা আছে অধিকার ভোগ করার। গণপরিষদের মাধ্যমে যে সংবিধান প্রণীত হচ্ছে - সে সংবিধানে পাহাড়িদের কথা বিবেচনা রাখবেন।

আমি লারমাকে প্রায় বলতাম অধিকার বঞ্চিত হওয়ার ব্যাথা আমরা বাঙালিরা ভালো বুঝি। কারণ বাঙালি নিজেই এই ব্যাথায় ভুক্তভোগী। তাই ভুক্তভোগী হিসেবে আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি পাহাড়িদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। আমি লারমাকে বলেছি সংবিধান সকলের জন্য সমান। সেখানে কারোর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য থাকবে না। সংবিধানে সকলে সমান মর্যাদা ভোগ করবে। সকল ধর্মের, সকল জাতির মানুষের সমান অধিকার থাকবে। জবাবে লারমা বলতেন, সকলের সমান অধিকার তা ঠিক আছে। কিন্তু যারা বঞ্চিত তাদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে, অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করার জন্য লারমা খুবই সোচ্চার কথাবার্তা বলতেন। তিনি পাহাড়ি মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্বকীয়তার স্বীকৃতির বিষয়ে কথা বলতেন। আমরা বলতাম, আমাদের যে ঐক্য তা মর্যাদার ঐক্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে কাউকে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া আমাদের নিয়ম নয়। আমরা কোনদিন ভাবতে পারিনি– ভুক্তভোগী হিসেবে অন্য কাউকে বঞ্চিত করবো, সংখ্যালঘুদেরকে নিপীড়ন করবো। আমরা সংবিধানে সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মানুষদের সমানাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছি।

সংসদে লারমা প্রায়ই বলতেন অতীতে পাহাড়িরা বঞ্চিত হয়েছে। তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা উনাকে বলেছি অতীতে বাঙালিরাও বঞ্চিত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। সে কারণে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা আমাদের অজানা থাকার কথা নয়। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিশেষ উন্নয়ন প্রসঙ্গে আমি লারমাকে বলেছি- উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করে আমাদেরকে জমা দেন। প্লানিং কমিশনের সঙ্গে কথা বলুন। প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যানসহ যারা দায়িত্বে আছেন নুরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান সকলে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। প্লানিং কমিশন দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। সুতরাং আপনি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ পরিকল্পনা প্লানিং কমিশনে তুলে ধরেন। লামরা আমার কথায় আস্থা রাখলেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে প্লানিং কমিশনে তা উত্থাপন করলেন। আমরা উনার কাছ থেকে সক্রিয় সাড়া পেলাম।

লারমার সঙ্গে পারস্পরিক আস্থার বিষয়ে ড. কামাল বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ আলোচনা করতে করতে আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আমরা নিছক কথা বলার জন্য কথা বলিনি। একে অপরকে বিশ্বাস করে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল তার সঙ্গে প্রথম দিকে আমাদের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল ধীরে ধীরে তা কাটতে শুরু করেছে। তিনি আমাদের উপর আস্থা রাখা শুরু করেছিলেন। আমাদের আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন হয় কিংবা বাস্তবায়নের জন্য তিনি কিছুটা ধৈর্য্যও ধারণ করার উদারতা দেখিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লারমার সাক্ষাৎ হওয়া প্রসঙ্গে ড. কামাল বললেন, লারমার উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে উনার বৈঠকের ব্যবস্থা করলাম। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লারমার সে বৈঠক খুবই ফলপ্রসু হয়েছিল। লারমার পরিকল্পনা শুনে বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন এসব খুবই যুক্তিযুক্ত। প্রস্তাব শুনে বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, মানবেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবগুলো নিয়ে একটা বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিতে। বঙ্গবন্ধু আমাকে আবারও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, দাতাদের সঙ্গে বৈঠকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরতে হবে। দাতাগোষ্ঠীকে রাজি করাতে হবে তারা যেন পাহাড়ি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বঙ্গবন্ধু সেই সময় মানবেন্দ্র বাবুর বিশেষ উন্নয়ন প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। সেই সময়ের সবচেয়ে দক্ষ ও সিনিয়র সিএসপি এ. কে. এম. আসাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হলো। পাহাড়ি এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এই কমিটি কাজ শুরু করলো। বঙ্গবন্ধু যত দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মানবেন্দ্র লারমার সাথে একটা সুসম্পর্ক ছিলো। আমাদের প্রধান কাজ ছিলো কনফিডেন্স বিল্ডিং করা। সেজন্য আমরা প্রচুর সময় নিতাম। আমার মনে হচ্ছিল আমরা সফল হচ্ছিলাম।

এম এন লারমার নেতৃত্বের গুণাবলী প্রসঙ্গে ড. কামাল বলেন, তিনি যুক্তি বিশ্বাস করতেন। অনেক বিষয়ে আমার সাথে দ্বিমত কিংবা ভিন্নমত থাকলেও তিনি আমার কথা মন দিয়ে শুনতেন। যুক্তি-পাল্টা যুক্তির মাধ্যমে তিনি আলাপ চালাতেন। কোন সময় তাঁকে বিরক্তবোধ করতে দেখিনি। তিনি যাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণ। প্রতিটি আলোচনায় লারমা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে বার বার স্মরণ করে দিতেন। তিনি শুধু বলেই ক্ষান্ত হতেন না। কাজগুলো, আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কিভাবে আদায় করানো যায় সে নিয়ে লেগে থাকতেন। সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর রাখতেন। লারমার এই একাগ্রতা দেখে বঙ্গবন্ধু তাঁকে প্রস্তাব দিলেন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে নিজেই যেন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু মানবেন্দ্র রাজী হলেন না। তিনি বললেন, এতে করে যারা তাঁকে সংসদে পাঠিয়েছে সেসব মানুষরা ভুল বুঝবে। তারা মনে করবে লারমা এখন নিজের জন্য কাজ করা শুরু করেছে। সেই সময় মন্ত্রীত্ব পাওয়াটা ছিল গৌরবের। যারা মন্ত্রী পরিষদে ছিলেন তাঁরা সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিভিন্ন সময় কারাবরণকারী। দেশের মানুষদের কাছে তাঁদের ছিল বিশাল মান-মর্যাদা। কিন্তু মানবেন্দ্র এসব মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে একই কাতারে বসার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন– শুধুমাত্র তাঁর জনগণের কথা ভেবে। তাঁর এই মহান হৃদয়ের পরিচয় সেদিন আমি পেয়েছিলাম। জনগণের প্রতি এত ভালোবাসা এত টান খুব কমই দেখা যায়।

এম এন লারমা শুধুমাত্র পার্বত্য জনগণের কথা বলেননি, তিনি গরীব মেহনতী মানুষের কথা জাতীয় সংসদে তুলে ধরতেন। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল বলেন, লারমা প্রগতিশীল চিন্তা করতেন। তিনি ন্যায়-নীতি ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন, আইনের শাসনের পক্ষে ছিলেন। শ্রমজীবি মানুষদের পক্ষে জাতীয় সংসদে একাধিকবার আলোচনা উত্থাপন করেছিলেন। তিনি কৃষকদের কথা ভাবতেন, তাঁতীদের কথা, জেলেদের কথা বলতেন। মানবেন্দ্র বাবু একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য সংসদে আলোচনা করতেন।

লারমা পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের দাবি তুলেছিলেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লারমার এই দাবির প্রসঙ্গে ড. কামাল বলেন, উপনিবেশিক আমলের সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যমত ছিল। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে আমাদেরও দ্বিমত ছিল না। যার যার এলাকার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সেই এলাকার লোকের হাতে থাকবে সেই ধরনের স্থানীয় সরকারের আমরা বিরোধী ছিলাম না। শুধু পাহাড়িরা কেন, সাতক্ষীরা, খুলনা কিংবা নোয়াখালীর মানুষ কেন ঘন ঘন রাজধানীতে ধরণা দিতে আসবে। তাই আমরা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের বিষয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। ফেডারেল পদ্ধতির শাসন কাঠামো দরকার ছিল বলে আমরা মনে করিনি। তখন ১৯টি জেলা ছিল। ১৯টি জেলার জন্য ১৯টি প্রদেশ গঠন, প্রাদেশিক সরকার গঠন, ভিন্ন ভিন্ন আইন পরিষদ এইসব প্রশাসনিক জটিলতায় আমরা যেতে চাইনি। প্রাদেশিক সরকারের জন্য একটা বিশাল ব্যয় রাখতে হতো। স্বাধীনতার পর পরই এই ধরনের ব্যয়ভার বহন করা আমাদের সম্ভব ছিল না। তবে কার্যকর স্থানীয় সরকারের পক্ষে আমরা ছিলাম। রাষ্ট্র উপর থেকে তার জনগণকে কিছু চাপিয়ে দেবে না, উন্নয়নসহ সকল ধরনের পরিকল্পনা স্থানীয় জনগণ স্বাধীনভাবে গ্রহণ করবে সে ধরনের স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা ছিল।

আপনারা তো সকলকে বাঙালি হতে বলেছিলেন– লারমা তার বিরোধীতা করেছিলেন। এই বিষয়ে ড. কামাল বলেন, এটা দীর্ঘ অনুভূতির ব্যাপার। একটা রাষ্ট্রের জন্য, জাতিগত স্বীকৃতির জন্য আমাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। একটা রাষ্ট্রের জন্য আমাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। 'জাগো বাঙালি জাগো' বলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। বাঙালি জাতির স্বীকৃতির জন্য আমাদেরকে রক্তাক্ত যুদ্ধও করতে হয়েছিল। বাঙালি পরিচয়ে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র মুক্ত হতে পারেনি। আমাদের এই বাঙালি হওয়া নিয়ে একটা প্রবল অনুভূতি কাজ করেছিল। হাজার বছরের বাঙালি জাতির স্বীকৃতির যে দাবি, সেটা উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। কিন্তু বাঙালি জাতির স্বীকৃতি পাওয়া অর্থ এই নয় যে, আমরা পাহাড়িদের জায়গা জমি দখল করবো, তাদেরকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করবো। অন্যের সম্পদ, সহায় সম্পত্তি দখল করার কথা আমরা কোনভাবেই কল্পনাও করতে পারিনি। তবে একটা আশংকা ছিলো সেটা হচ্ছে পাহাড়িদের পরিচয় সংকট নিয়ে। আমাদের বাঙালি হওয়া অন্য কাউকে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় ছিল না। পাহাড়িদের স্বাতন্ত্র্য পরিচয়, তাদের নিজস্ব পরিচিতি বাঙালি জাতির পরিচয়ের সঙ্গে বিরোধজনক হবে সেরকম চিন্তা আমরা করিনি।

সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব স্বীকার করে ড. কামাল বলেন, অনেকেই আমাকে বলেন আপনি তো সংবিধান প্রণয়ন করেছেন; পাহাড়িদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে লিখতে তো পারতেন। আমারও মনে হয় লেখা তো যেত। কিন্তু না লেখার পেছনে কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি। কারোর নিজস্ব জাতিগত পরিচয় নিয়ে বিতর্ক হতে পারে না, দিনকে যেমন দিন বলতে হবে, রাতকে যেমন রাত তেমন প্রত্যেকের জাতিগত পরিচয় বিতর্কহীনভাবে সত্য।

এম এন লারমাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধী বলে যে আখ্যায়িত করা হতো এ বিষয়ে ড. কামাল বলেন, লারমা সব সময় আলাপ আলোচনার পথ খোলা রাখতেন। আমরা যখন কথা বলতাম তখন কোন সময় তিনি বলেননি, না এসব অনেক শুনেছি, আর কোন কথা শুনব না। তিনি কোন কিছুই যুক্তি ছাড়া খারিজ করতেন না। যাদের সমাধানের ইচ্ছা ছিল না, মীমাংসা করার ইচ্ছা ছিল না, সব সময় মানি না, মানব না বলতেন তারাই লারমাকে এ ধরনের অভিধায় আখ্যায়িত করেছিল। লারমা সমসময় মীমাংসার পথ খোলা রাখতেন। আলোচনা চালিয়ে যেতেন। মানি না, মানব না ধারণায় লারমার বিশ্বাস ছিল না।

একজন সংসদ সদস্য হিসেবে এম এন লারমার মৃত্যুর পর জাতীয় সংসদে কোন শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়নি বলে আমরা জানি। এই প্রসঙ্গে ড. কামাল বলেন, সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে লারমার জন্য শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কি হয় নাই সে বিষয়ে আমার জানা নাই। এ দেশতো নিয়মহীন একটা দেশ। বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পরেও শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়নি। স্বীকৃতির জন্য কোনরূপ কার্পণ্য করা ঠিক নয়। মানবেন্দ্র লারমা একজন সৎ, আদর্শবান রাজনীতিবিদ। তাঁকে অনুকরণ করা, অনুসরণ করা, স্বীকৃতি দেয়া আমাদের সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : সতের বছরের পোস্টমর্টেম

॥ রাহমান নাসির উদ্দিন ॥

আজ থেকে সতের বছর আগে, ঠিক এইদিনেই, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সাল, মহাধুমধাম করে পার্বত্য চুক্তি, যা জনপ্রিয় বয়ানে 'শান্তি চুক্তি' নামে জারি আছে, স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি বাবু জ্যোতিরিন্দ্রি বোধিপ্রিয়া লারমা ওরফে সন্তু লারমা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। যা দেশ এবং বৈদেশে বেসুমার বাহবা অর্জন করে। নানান বর্ণিল বেলুন উড়িয়ে এবং গুচ্ছ গুচ্ছ শান্তির শ্বেত-কপোত আকাশে উন্মুক্ত করে বেশ সাড়ম্বরতার ভেতর দিয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এ চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, যিনি বর্তমানেও প্রধানমন্ত্রী, ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এমনকি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিলেন, যা শেষমেষ আর আগায়নি। আজ ঠিক সতের বছর পরে, পার্বত্য চুক্তিকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি রীতিমতো প্রায় 'উল্টো'। আজ এ চুক্তি স্বাক্ষরের সতের বছর পূর্তি উৎসব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, বৃহত্তর চট্টগ্রামে এবং রাজধানী ঢাকায়। তবে, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দৃষ্টিকটুভাবে একপাক্ষিক; কেননা চুক্তির স্বাক্ষরকারী একটি পক্ষ হিসেবে রাষ্ট্র বেমালুম রিলাকটেন্ট (অনাগ্রহী)।

পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বা এ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যখন এ দিনটি তাদের দাবি পেশ করবার একটা বাৎসরিক মওকা হিসেবে উদযাপন করছে, রাষ্ট্র তখন নিষ্ঠুরভাবে নির্বিকার। ফলে, পার্বত্য চুক্তির এ দিন আজ আর উৎসবের মেজাজে জারি নেই। দিনটি উদযাপন হয়, কিন্তু সেখানে আনন্দের বেলুন নেই, আছে বিশ্বাসভঙ্গের গভীর হতাশা। সেখানে শান্তির শ্বেত কপোত নেই, আছে তীব্র অসন্তুষ্টির সামষ্টিক দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু কেন? এ নিবন্ধে তার যৎসামান্য বিচার-বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, যার অধিকাংশই নন-একাডেমিক এবং এনজিও বা কনসালটেন্সি এজেন্সির বা মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট। পার্বত্য চুক্তি নিয়ে এবং চুক্তির পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা নিয়ে বস্তা বস্তা লেখালেখি হয়েছে, যার অধিকাংশই বস্তাপঁচা। নানান সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-গোলটেবিল টক হয়েছে, সেখানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বিস্তর আহাজারি হয়েছে। কিন্তু দৃশ্যত এবং কার্যত সব অরণ্যে রোদন; কেননা কাজের কাজ খুব বেশি কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না।

এই জনগোষ্ঠীর জীবনের আদৌ গুণগত পরিবর্তন এসেছে কিনা; আদৌ একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমতার ভিত্তিতে ইজ্জতের সঙ্গে জীবনযাপন করবার মানসম্মত কোনো ব্যবস্থা এবং পরিস্থিতি পাহাড়ে তৈরি হয়েছে কিনা, সেটা হল মৌলিক জিজ্ঞাসা। ফলে ফি বছর চুক্তির বার্ষিকী উদযাপন এবং চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের তীব্র আহাজারি একটি সাংবাৎসরিক পলিটিক্যাল-রিচ্যুয়ালে পরিণত হয়েছে।

আর পাহাড়ের সঙ্গে কোনো ধরনের সংযোগবিহীন কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সুশীল মেট্রোপলিটন আয়োজনে বসে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বাৎসরিক বিলাপ করেন। যা হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) দাবির তীব্রতায় কিঞ্চিৎ নোক্তা যুক্ত করে এবং পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর জীবনে শান্তি আনয়নের যে আন্দোলন তাতে সামান্য 'তা' দেয় কিন্তু আখেরে মাকাল ফল উৎপাদন করে। কেননা, পাহাড়ের সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে উপলব্ধির ব্যর্থতা এবং তাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করবার অক্ষমতা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে।

এখানে বলে নেওয়া জরুরি যে, আমিও ব্যক্তিগতভাবে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই। আমিও মনে করি, এর যথাযথ বাস্তবায়ন পাহাড়ে পুরোপুরি না হলেও শান্তি আনয়নে যথেষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের, দীর্ঘ বছরের গভীর বৌদ্ধিক-একাডেমিক সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করি, সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে মূল সমস্যা কেবলই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নয়; কেননা চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ নয়। চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি, মোটা দাগে চারটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে।

১. পাহাড় এবং পাহাড়ি আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি;

২. অতিরিক্ত সেনা-উপস্থিতি এবং পরোক্ষ সেনা-শাসন;

৩. ভূমি-সমস্যার স্থায়ী সমাধান;

৪. বাঙালি-সেটেলারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব।

দুই.

বিশ্বখ্যাত নৃবিজ্ঞানী জেমস স্কট তাঁর বিখ্যাত কিতাব The Art of Not Being Governed (Scott, 2009)-এ চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন 'সমতল' কীভাবে 'পাহাড়' নির্মাণ করে, শাসন করে এবং শোষণ করে। আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা, আবির্ভাব এবং কার্যকারিতা কীভাবে পাহাড় এবং পাহাড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হুমকির মুখে ফেলে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে পাহাড় সবসময় রাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলেছে এবং রাষ্ট্রের 'উন্নয়নের লম্বা হাত' থেকে দূরে থাকতে পালিয়ে বেড়িয়েছে।

স্কট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জুমিয়া-অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে তাঁর থিসিস দাঁড় করলেও দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এর অন্যথা হয়নি। তবে পার্থক্য এতটুকুই যে, এখানে পাহাড় আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সবসময় সংযুক্ত হতে চেয়েছে, রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে বেড়ায়নি। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশ যখন ভারত এবং পাকিস্তান দু'টি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়, পাহাড় এবং পাহাড়ের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ তখন ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু এই জনগোষ্ঠীর আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষায় কোনো ধরনের গুরুত্ব না দিয়ে, দেশবিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের (পূর্ব পাকিস্তানের) অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হলে, পাহাড়ের জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে সাংবিধানিক কাঠমোয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইল। রাষ্ট্র অতটুকু সামান্য উদারতাও দেখাতে পারেনি। সমস্ত অ-বাঙালিকে অর্থাৎ সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে রাখা হল।

এরপরের ইতিহাস কারও অজানা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করা হল যা পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের ক্ষেত্রেও আমরা হরহামেশা দেখে থাকি। কেননা, অধিকারবঞ্চিত, রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা নির্যাতিত এবং ন্যায্য দাবি নিয়ে যখন সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিজেদের জাতিগত অধিকারের জন্য মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত হয়, রাষ্ট্রের ভাষায় তাঁরা হয়ে উঠে বিচ্ছিন্নতাবাদী। [বিস্তারিত দেখুন: Appadurai 2006; Spencer 2007]

পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাষ্ট্রীয় পলিসির অংশ হিসেবে এক ধরনের সামরিকায়ন করা হল। এক হিসাব অনুযায়ী, সেখানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ মজুত করা হয়েছিল। [বিস্তারিত দেখুন: Mohsin, 2002:172]

এই সেনা মোতায়নের পেছনে কথিত শান্তিবাহিনীর কিছু সশস্ত্র কার্যক্রম অজুহাত হিসেবে হাজির করা হয় যা সর্বাংশে সত্য নয় (বিস্তারিত পরের অংশে)। প্রায় চার লক্ষ ভূমিহীন বাঙালি কৃষককে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হল, যারা 'বাঙালি সেটেলার' হিসেবে পরিচিত। আদিবাসীদের জমি-জল-জঙ্গল হয়ে উঠল বাঙালি সেটেলারদের জীবন ও জীবিকার উৎস। আর তা পরিস্থিতি করে তুলল সংঘাতময়।

আখেরে লাভ হয় রাষ্ট্রের। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সেনাবাহিনীর বিরাট বহরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মজুদ রাখার বন্দোবস্ত পাকা হয়। তারপর পার্বত্য চুক্তি এবং চুক্তি-পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের ভূমিকা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং (অপ)তৎপরতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতিবাচক অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। অতিসম্প্রতি, যখন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হল, পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সমতলের আদিবাসীসহ সংবিধানে নিজেদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চাইল, কিন্তু রাষ্ট্র এ সামান্য উদারতাটুকু দেখাতে কৃপণতা দেখাল। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হল, বাংলাদেশে কোনো 'আদিবাসী' নেই। সংবিধানে সংযোজিত হল 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'। কোনো জাতি ক্ষুদ্র না বৃহৎ, একবিংশ শতাব্দীতে সেটা আর 'ডেমোগ্রাফিক ফিগার' বা জনগোষ্ঠীর সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। [বিস্তারিত দেখুন: Uddin, 2014]

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে বিবেচনা করা মূলত রাষ্ট্রের একটি মেজরিটারিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি। তাই, এ দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শিক, দার্শনিক এবং গুণগত পরিবর্তন ছাড়া, কেবল পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

তিন.

একবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনায় সেনা-শাসনকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিপ্রতীপ বিন্দুতে প্রতিস্থাপন করে বিবেচনা করা হয়; কেননা সেনা-শাসনের অধীনে মানুষের মৌলিক, মানবিক এবং শাসনতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত হয় না। সেটা পরোক্ষ হোক আর প্রত্যক্ষ হোক। ইতিহাসে তার ভুরি ভুরি নজির আছে। বাংলাদেশেও এর অন্যথা হয়নি।

এখানে মনে রাখা জরুরি যে, এদেশের একজন সচেতন এবং সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নানান গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়ে আমিও প্রীত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকায়ও গৌরব বোধ করি। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সম্প্রতি রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় উদ্ধারকার্যে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সেনাবাহিনীর প্রতি আমার ইতিবাচক মনোভঙ্গি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই, আমি কোনো অবস্থাতেই সেনাবাহিনীর বিপক্ষে নই, কিন্তু সেনা-শাসনের বিপক্ষে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যত অফিসিয়াল কোনো সেনা-শাসন নেই, কিন্তু মানুষের নিত্যদিনের জীবনে সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত উপস্থিতি (excessive presence) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে 'সিকিউরিটি'র নামে অতিরিক্ত তল্লাশির ব্যবস্থাপনা মানুষকে এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে বাস করবার পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। [দেখুন: রীয়াজ, ২০১৪]

তাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের প্রত্যক্ষ সেনা-শাসন জারি আছে বললে খুব একটা অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া, আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যন্ত গ্রামে-পাড়ায় গবেষণার কাজ করি। সেসব পাড়ায় সাধারণ পাহাড়ি গ্রামবাসীর কাছে মিলিটারি মানে হচ্ছে 'সরকার'। তাই, মিলিটারি কীভাবে মানুষের নিত্যদিনের জীবনে হাজির হয় এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবন কীভাবে রেগুলেট করে, তা পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। [বিস্তারিত দেখুন: রাহমান, ২০১৩]

কেননা, মিলিটারির আচরণ এবং ভূমিকা রাষ্ট্রের চরিত্র রিপ্রেজেন্ট করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে মিলিটারি জাতীয় এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষায় যে ভূমিকা রাখছে, তার পাশাপাশি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর

জীবনেও এক ধরনের নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ফলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।

যেমন, 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইনডিজেনাস অ্যাফিয়ার্স' ২০১২ সালে একটি তালিকা প্রকাশ করেছে; সেখানে কীভাবে ২০০৪ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মিলিটারি কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার সবিস্তার বিবরণ আছে। যেমন, মিলিটারি কর্তৃক ১৫ জনকে হত্যা, ৩১ জনকে আহত, ২ জনকে ধর্ষণ, ১৬ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা, ৩২টি লুণ্ঠনের ঘটনা, ৫টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, ৭টি মন্দির ভাঙচুর, ৪৬৪ জনকে গ্রেপ্তার, ৩৭৪ জনকে টর্চার, ১৫৪ জনকে প্রহার, ১৭টি পবিত্রতানাশের ঘটনা, ৮৫টি নাজেহালের ঘটনা, ২৮৫টি উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে বলে এ রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে। [IGWIA Report-14, 2012:15]

একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠায় অতিরিক্ত সেনা-উপস্থিতি একটি বড় সমস্যা। কেননা, মূলত মিলিটারি হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বে দেশে দেশে রাষ্ট্রের এক ধরনের ধ্রুপদী প্রতিনিধি। [বিস্তারিত দেখুন: Eva, 2013]

কাজেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য সেনা ছাউনি বলবৎ রেখে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জিগির তুলে এবং সত্যি সত্যিই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেও সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। হয়তো অনেকে বলবেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হলে, চুক্তির শর্তানুযায়ী অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলি স্থায়ীভাবে তুলে নেওয়া হবে। সেটা হলে ভালো, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই পরোক্ষ সেনা-শাসন যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে জারি থাকে, এ অঞ্চলে কোনোদিনই শান্তি ফিরে আসবে না। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

চার.

জল-জমি-জঙ্গল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত যা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখায় আদিবাসী মানুষের জীবনের প্রাণসঞ্চারণী হিসেবে এ ত্রয়কে বিবেচনা করেছেন। [দেখুন: মহাশ্বেতা দেবী, ২০০৩ (১৯৭৭)]

শহুরে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের যা বিনোদন, তা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি। আর যেহেতু এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা জুম চাষ, সেহেতু ভূমি তার জীবনধারণের অন্যতম উৎস। তাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি-সমস্যা এবং ভূমি-ব্যবস্থাপনা এতদঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকেই, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বেশ কয়েক বার পার্বত্য ভূমি কমিশন গঠন করা হয়। হাঁকডাক দিয়ে কাজকর্ম শুরু করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে এ পর্যন্ত পাঁচজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়, কিন্তু ভূমি-সমস্যার সমাধান হয়নি। একটি হিসাব মতে, ১৯৯৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে কমিশনে, ভূমি-বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তন্মধ্যে, প্রায় দু'হাজার আবেদন ফয়সালা করবার জন্য নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটিও ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১-এর ১৩ টি সংশোধনীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, ২০১১ (সংশোধিত ২০১২) ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জুলাইয়ের ৩০ তারিখ অনুমোদন করে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা পরবর্তী পার্লামেন্টের অধিবেশনে তোলার কথা ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি তার সুরাহা হয়নি। সরকার এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে জেএসএস, উভয় পক্ষ সম্মত হলেও কেন তা আদৌ আলোর মুখ দেখেনি, তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি, যা উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সংকট আরও তীব্র করেছে।

অন্যদিকে বাঙালি সেটেলাররা এ সংশোধনীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হককে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনিও একদিন মাত্র অফিস ভিজিট করে সংবাদপত্রে পোজ দিয়ে গায়েব হয়ে বসে আছেন; অন্তত দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম আমার জানামতে শুরু হয়নি।

এ হচ্ছে বিগত সতের বছরের পার্বত্য ভূমি কমিশনের কার্যক্রমের সালতামামি। কিন্তু ভূমি-সমস্যার দৃশ্যমান সমাধান এখনও পর্যন্ত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ৯০ হাজারেরও বেশি পাহাড়ি 'অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু' হিসেবে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অন্যদিকে প্রায় ১২,২২৩ পরিবারের ৬৪,৬১১ পাহাড়ি ভারতের ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসা' প্রত্যাগত উদ্বাস্তু' হিসেবে বর্তমানের পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করছে, কিন্তু এখনও নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত। [Amnesty International Report, 2013]

এত বিপুল সংখ্যক লোককে কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা করে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই কিংবা দৃশ্যমান পরিকল্পনা নেই। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরকারি, বেসরকারিভাবে নানান অজুহাতে ভূমি দখলের মধ্য দিয়ে জুমচাষের জমি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে; ফলে অসংখ্য পাহাড়ি জুম চাষ করবার জন্য পর্যাপ্ত জমি পাচ্ছেন না।

এ রকম একটি অবস্থায় কেবল পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। পাহাড়ি মানুষজনকে মাথা গুঁজবার জায়গা দিতে হবে; তাদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে; তাদের জমি-জল-জঙ্গল তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যথায়, শান্তি একটি চিরন্তন অশান্তির চাদরে মোড়া থাকবে।

পাঁচ.

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে বাঙালি সেটেলারদের বিষয়টি সঠিকভাবে হ্যান্ডেল করতে না পারা। পার্বত্য চুক্তির কোন জায়গায়, কোন ধারায় কিংবা উপধারায় সুস্পষ্টভাবে বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে পর্যায়ক্রমে কখন, কোথায় এবং কীভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তার কথা লেখা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে একটি অলিখিত চুক্তি হয়েছে স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষের মধ্যে, এ রকম একটি ধারণা এখন মোটামুটি সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ১৯৭৯-'৮১ সালে পর্যায়ক্রমে ৪ লাখ বাঙালিকে রাষ্ট্রের পলিসির অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন করানো হলেও বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় পরে সে সংখ্যা এখন প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হয়েছে।

তাছাড়া, ১৯৭৯-'৮১ সালের সেই সেটেলার বাঙালিরা এখন আর অত নিরীহ, অসহায়, গোবেচারা প্রকৃতির নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের ভোটের রাজনীতি। যুক্ত হয়েছে আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপির ক্ষমতার রাজনীতি। ফলে, বহুমাত্রিক রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি সেটেলাররা নিজেরাই একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠেছে। গঠন করেছে 'সমঅধিকার আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন।

এ সংগঠনকে সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে স্থানীয় সিভিল এবং মিলিটারি প্রশাসন- এ মর্মে নানান অভিযোগ রয়েছে পাহাড়িদের মধ্যে। তাছাড়া, বাঙালি সেটেলারদের অনেকে মনে করেন, 'পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়িদের কাছে যেন লিজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' অনেক বাঙালি সেটেলার মনে করেন, 'পাহাড়িরা বাংলাদেশের নাগরিকই নন। তারা এসেছে ভারত এবং বার্মা থেকে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত!' এ ধরনের অত্যন্ত নেতিবাচক মনোভাব এবং মনস্তত্ত্ব নিয়ে বাঙালি সেটেলারদের অনেকে পাহাড়িদের বিবেচনা করেন এবং সে মোতাবেক আচরণ করেন।

তাই, বাঙালি-সেটেলারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের ইতিবাচক রূপান্তর ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্যিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এখানে মনে রাখা জরুরি যে, পার্বত্য অঞ্চলে অনেক বাঙালি, যারা সেটেলার নন, দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাদের অনেকের সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে পাহাড়িদের। অনেকের সঙ্গে রয়েছে নানান ধরনের ব্যবসায়িক এবং যৌথ মালিকানার নানান কার্যক্রম। দীর্ঘদিনের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে, নানান সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসব স্থায়ী বাঙালিদের সঙ্গে রয়েছে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত সুন্দর সম্পর্ক। [বিস্তারিত দেখুন: চৌধুরী, ২০১৪]

সমস্যা রয়ে গেছে সেটেলার-বাঙালিদের মধ্যে, যাদের অনেকেই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো লেভেলেই কোনো রকম ইন্টেগ্রেশন করবার চেষ্টাই করেননি। অধিকন্তু, পাহাড়িদের জায়গা দখল করা, জমির ফসল চুরি করা, জুমের শস্য লুট করা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা, পাহাড়ি নারীদের ধর্ষণ, পাহাড়ি গ্রামে অগ্নিসংযোগ এবং খুন করবার মতো অসংখ্য ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ রয়েছে এসব বাঙালি সেটেলারদের। তাই, সেটেলার সমস্যার একটা দীর্ঘমেয়াদি এবং সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনোভাবেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

শেষের কথা

শুরুর কথাই মূলত শেষের কথা। আর মাঝখানটাই কিছু তথ্য-উপাত্ত, বাস্তবতা এবং কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক বয়ান। এটা আমাদের মনে রাখা জরুরি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের জীবনের ইতিহাস অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিত্য সংগ্রামের ইতিহাস। [দেখুন: Uddin, 2005]

বহু রক্তক্ষরণের পর দীর্ঘ আড়াই যুগের প্রায় যুদ্ধাবস্থা থেকে একটি যৌথ চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জীবনে একটি শান্তির জীবন যাপন করবার যে আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন জন্ম হয়েছিল আজ থেকে সতের বছর আগে, তা ক্রমান্বয়ে ফেকাসে হয়ে হতাশার দীর্ঘ হাত ধরে বেদনায় 'নীল' (কষ্টের রঙ) হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি সরকার এবং জেএসএস-এর মুখোমুখি অবস্থানের কারণে সে 'নীল' কষ্ট আবার 'লাল' হয়ে উঠবার আশংকা তৈরী করছে। সেটা কারও কাম্য নয়। তাই, পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য দ্রুততম সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়াটা জরুরি। আর যদি পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন হয়, তবে উপরোল্লিখিত চারটি প্রধান প্রতিবন্ধকতার বেশ কয়েকটি (মিলিটারি ইস্যু, ভূমি-সমস্যা এবং সেটেলার সমস্যা) বিষয় আপনা আপনিই সুরাহা হয়ে যাবে। এর সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে আরও কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমি নিবন্ধের গতরে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

সবচেয়ে বেশি জরুরি, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমাদের সামাজিক মনস্তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। এই জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার এবং যথাযথ মর্যাদার বিষয়টি কেবল মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে মনেও নিতে হবে।

নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ প্রসঙ্গে

॥ উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা ॥

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অধিকতর সুদৃঢ় করার অব্যাহতভাবে আহ্বান জানিয়ে আসছে। জনসংহতি সমিতি তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী মহল বরাবরই গোড়া থেকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করার এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপর আঘাত করার ষড়যন্ত্র করে আসছে। সত্তর দশকের গোড়াতেই পাহাড়ি যুব সংঘ, ট্রাইবাল পিপলস পার্টি (টিপিপি), বামাঞ্চাতা গ্রুপ, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি ও এর সহযোগী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম গণমুক্তি পরিষদ ইত্যাদি সশস্ত্র সংগঠনের প্রতিবিপ্লবী অপতৎপরতার মাধ্যমে জুম্ম জনগণের ঐক্য-সংহতিতে বিভাজন তৈরীর অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এসব অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বিচক্ষণতার সাথে সুসংহত নেতৃত্বের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই-সংগ্রাম করে জুম্ম জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সম্ভব হয়েছে। এমনকি সরকারের মদদপুষ্ঠ ট্রাইবাল কনভেনশনের মতো সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র সফলভাবে মোকাবেলা করে জুম্ম জনগণের ঐক্য-সংহতি অবিচল রেখে জনসংহতি সমিতি গণমানুষের আন্দোলনকে বেগবান করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে আশি দশকে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু ও উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীর চক্রান্ত, বিভেদপন্থী অপতৎপরতা ও পার্টি-শৃঙ্খলা পরিপন্থী আত্মঘাতি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা ও নিষ্পত্তি করে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের ঐক্য-সংহতি বজায় রেখে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এসব ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে জোরালো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতি এক পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে সরকারকে বাধ্য করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হতে, যে চুক্তিতে জুম্ম জনগণসহ পার্বত্যবাসীর স্বশাসনের অধিকার, ভূমিসহ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম-অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের অধিকারের ন্যূনতম ভিত্তি রচিত হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে তরুণ প্রজন্মের একটি গোষ্ঠী 'ইউপিডিএফ' নামে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে। যার ফলে জুম্ম জনগণ কিছু মাত্রায় দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতির উপর এক ধরনের সংকট তৈরী হয়। সেই সংকটের উপর মরার উপর খাড়ার ঘা-এর মতো ২০০৭-২০০৮ সালে জরুরী অবস্থা চলাকালে ১/১১-এর তথাকথিত সংস্কারের জোয়ারে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে কিছু মাত্রায় বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টি হয়। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের প্রতি এখনো আপামর জনগণের বিপুল আস্থা-বিশ্বাস ও সমর্থন সত্ত্বেও একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে জুম্ম জনগণের আন্দোলন ছোট-বড় তিনটি ধারায় বিভক্ত যা জুম্ম জনগণের একমুখী আন্দোলন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অন্যতম একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে জুম্মস্বার্থ বিরোধী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী কতিপয় পাহাড়ির যোগদান, যা জুম্ম জনগণের দ্বিধা-বিভক্তিকে আরো ত্বরান্বিত করে চলেছে।

সরকার বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে। আপামর জুম্ম জনগণসহ দেশে-বিদেশে প্রবল দাবি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকার চরম উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে বা এক পাশে রেখে সরকার অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। দেশের শাসকগোষ্ঠী একদিকে 'ভাগ করো শাসন করো' এই নীতির ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের আন্দোলন ও নেতৃত্বকে দ্বিধাবিভক্ত করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপর আঘাত হেনে চলেছে, অন্যদিকে সেটেলার বাঙালিসহ সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল, জুম্ম নারীর উপর হত্যা ও ধর্ষণ, অবাধে অব্যাহত অনুপ্রবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ক্ষেত্রে এখনো সেনা কর্তৃত্ব ও বৈরী জেলা প্রশাসন যৌথভাবে ইসলামিকরণের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। নানা কলাকৌশলের মাধ্যমে অতি সুক্ষ্ম উপায়ে দেশের সমতল অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে জুম্ম জায়গা-জমি জবরদখলের প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে পদদলিত করে জুম্মদের মৌজা ও জুম ভূমির উপর সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে শত শত একর ভূমি ইজারা প্রদান করে এবং পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা করে জুম্মদেরকে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এক নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির দাঁড়প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

এমনিতর পরিস্থিতিতে আজ প্রশ্ন উঠে এসেছে যে, জুম্ম জনগণের এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী? এটা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, এই জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হচ্ছে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অধিকতর সুদৃঢ় করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো– এই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি কিভাবে সুদৃঢ় হতে পারে। কিভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে জুম্ম জনগণের ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে অধিকতর সুদৃঢ় জাতীয় নেতৃত্ব। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিকতর সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ব্যতীত কোন আন্দোলন-সংগ্রাম সফল হতে পারে না তা বিশ্বের দেশে দেশে সংগ্রামী ইতিহাসে দেখা গেছে। যে কোন আন্দোলন-সংগ্রামে বিভেদ-বিভাজন দেখা দিলে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি একাট্টা না হয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে তাহলে সে আন্দোলন-সংগ্রাম কখনোই সফল হতে পারে না। পক্ষান্তরে দেখা গেছে যে, যে সকল নিপীড়িত জাতি তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, আন্দোলনের কর্মসূচি ও নেতৃত্বকে অবিচলভাবে ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে সুদৃঢ়, একমুখী ও একাট্টা রাখতে সক্ষম হয়েছে সে সকল জাতি তাদের আন্দোলন-সংগ্রামে জয়ী হয়েছে। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনেও দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপর হানিকর নানা ঘটনা-প্রবাহ উপস্থিত হলেও সেসব পরিস্থিতিকে সফলভাবে মোকাবেলা করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় রেখে আন্দোলন, আন্দোলনের কর্মসূচি ও নেতৃত্ব একমুখী ছিল বলে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি পরবর্তী সময়ে চুক্তিকে কেন্দ্র করে এবং সর্বোপরি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ফলে এই একমুখী আন্দোলন, কর্মসূচি ও নেতৃত্বের ব্যত্যয় ঘটে এবং এর ফলে জুম্ম জনগণের জাতীয় আন্দোলনে এক চরম সংকট তৈরী হয় যা জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও নিরাপত্তাকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাই জুম্ম জাতির আসন্ন এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে, আন্দোলনের কর্মসূচিকে এবং জাতীয় নেতৃত্বকে একমুখী করা এবং ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে একাট্টা করা। প্রশ্ন হলো– কী ও কিভাবে অর্জিত হতে পারে সেই একমুখী আন্দোলন, নির্ভুল ও বাস্তব-সম্মত একমুখী কর্মসূচি এবং ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে সুদৃঢ় একমুখী নেতৃত্ব? বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুধা বিভক্ত কর্মসূচির ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে কালো চুক্তি আখ্যায়িত করে 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' আদায়ের নামে ইউপিডিএফ আন্দোলন পরিচালনা করে চলেছে। সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীও ভিন্ন ধারায় বাহ্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিগত ঐক্য ও সংহতি যদি না থাকে তাহলে কখনোই সেই আন্দোলন সুসংগঠিত ও একাট্টা হতে পারে না। কর্মসূচিগত ভিন্নতা আন্দোলনকে দুর্বল ও বিভক্ত করতে বাধ্য। তাই জুম্ম জনগণের এই আন্দোলনকে অবশ্যই নির্ভুল ও বাস্তবোপযোগী একমুখী কর্মসূচিতে রূপান্তর করতে হবে। তবেই এই আন্দোলন শক্তিশালী ও জোরদার হতে পারে এবং জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হতে পারে। তাহলে কী হতে পারে সেই নির্ভুল ও বাস্তব-সম্মত একমুখী কর্মসূচি?

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক দলিল ও হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লড়াই-সংগ্রাম ও জনমত গঠনের আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম, ইকোসক, মানবাধিকার পরিষদ, আইএলও ও ইউএনডিপিসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিভিন্ন মানবতাবাদী রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার রয়েছে যা আন্দোলনের অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে একাট্টা রয়েছে যা আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি হিসেবে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের আশু কর্মসূচি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিকে কেন্দ্র করে জুম্ম জনগণের আন্দোলন সুসংহত ও একমুখী করা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন একাধিক কর্মসূচির ভিত্তিতে পৃথক পৃথক আন্দোলন বজায় রাখলে কখনোই জুম্ম জনগণের আন্দোলন একমুখী হতে পারে না, শক্তিশালী হতে পারে না, সর্বোপরি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হতে পারে না।

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব টিকে থাকার মতো ন্যূনতম ভিত্তি বা অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। চুক্তিতে আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জিত না হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদার স্বীকৃতি ও সেই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন যার উপর সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি, বন, পরিবেশসহ ৩৩টি বিষয় অর্পিত; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ; বেদখলকৃত জুম্মদের ভূমি ফেরতদানসহ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি; শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও বহিরাগতদের জায়গা-জমি মালিকানায় বাধা-নিষেধ, জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন ইত্যাদি অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং চুক্তির মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারগুলো নিহিত রয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় স্বশাসনের অধিকারগুলো নিশ্চিত করা যায় বলে বলা যেতে পারে। সুতরাং চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মসূচির ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের আন্দোলনের কর্মসূচিকে একমুখী করার যুগোপযোগী বাস্তবতা রয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিকে কেন্দ্র করে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে কেবল একমুখী করলে হবে না, তার সাথে জুম্ম জনগণের জাতীয় নেতৃত্বকেও ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে একাট্টা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো জুম্ম জনগণের নেতৃত্বকে একাট্টা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। এক মুষ্টিতে আঘাত করলে আঘাত যত তীব্র ও শক্তিশালী হবে, দুই মুষ্টিতে আঘাত করতে তা তত জোরালো হতে পারে না। এক মুষ্টিতে আঘাত করলে শরীরের সর্বশক্তি একত্রিত হয়ে আঘাত তীব্রতর হয়ে থাকে। কিন্তু দুই মুষ্টিতে আঘাত করলে শরীরের শক্তি বিভক্ত হয়ে আঘাতের জোরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য এক মুষ্টিতে আঘাত করার মতো জুম্ম জনগণের সর্বশক্তিকে একত্রিত করে শাসকগোষ্ঠীর উপর তীব্রতর আঘাত হানার নিমিত্তে জুম্ম জনগণের আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতৃত্বকে একমুখী ও একাট্টা করার কোন বিকল্প নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানে জুম্ম জনগণের আন্দোলন বহুধা বিভক্ত। যার ফলশ্রুতিতে জুম্ম জনগণের নেতৃত্বও বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও জুম্ম জনগণের কতিপয় সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বা হচ্ছে। এধরনের বহুধা বিভক্ত ঝোঁকগুলো জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা শাসকগোষ্ঠীর এজেণ্ডা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে– এই বহুধা বিভক্ত জুম্ম নেতৃত্বকে কিভাবে ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে সুদৃঢ় ও একাট্টা করা যায়? কার নেতৃত্বে ও কোন পতাকাতলে কিভাবে ও কী উপায়ে সুসংহত নেতৃত্ব গড়ে তোলা যায়?

এটা অনস্বীকার্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দীর্ঘ চার দশকের অধিক গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌবরময় সংগ্রামের নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে। চারদফা সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৭২ সালে জুম্ম জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের যে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছিল তা আজো পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে অব্যাহত গতিতে বেগবান রয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে জুম্ম জনগণের অধিকারের সনদ – ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি – স্বাক্ষরিত হয়েছিল যা দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে সকল ক্ষেত্রে তার একটা স্বীকৃতি রয়েছে। দেশে-বিদেশে এখনো জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের গ্রহণযোগতা ও পরিচিতি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসেবে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নেতৃত্বের প্রশ্নে সাধারণ মানুষ এখনো আস্থাশীল। তাই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে একমুখী করার পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে জুম্ম জনগণের জাতীয় নেতৃত্বকে একাট্টা করা জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সকল প্রকার দল-মত-চিন্তাধারার উর্ধ্বে উঠে এই বাস্তবতাকে গ্রহণ করে জুম্ম জনগণকে অগ্রসর হওয়ার ভিত্তি বিরাজ করছে বলে বিবেচনা করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিভিন্ন দল-মত-চিন্তাধারার কর্মীবাহিনীকে পদ্ধতিগতভাবে জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক ধারায় সংহতকরণে জনসংহতি সমিতিকে যেমনি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিবেশ তৈরী করতে হবে, তেমনি অন্যান্য ভিন্ন দল-মতালম্বী কর্মীবাহিনীকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, একমুখী কর্মসূচি ও নেতৃত্বের পরিবর্তে বিভিন্ন দল-মত অক্ষুণ্ন রেখে যৌথ কর্মসূচির মাধ্যমেও আন্দোলনকে শক্তিশালী ও জোরদার করা যায়। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর যৌথ কর্মসূচির মাধ্যমে একযোগে আন্দোলন পরিচালনার যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার চিন্তা-ভাবনা তা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। জাতীয় ঐক্য-সংহতি সুদৃঢ়করণের স্বার্থে তথা জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে একমুখী ও নেতৃত্বকে একাট্টা করার ক্ষেত্রে এ ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সাময়িক কর্মসূচি হিসেবে হয়তো গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, এ ধরনের ঐক্য-সমঝোতা আপাত সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হলেও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কখনোই কার্যকর ও ফলপ্রসূ নয় বলে বিভিন্ন দেশের আন্দোলন-সংগ্রামে তার উদাহরণ রয়েছে। ইস্যু ভিত্তিক বা কর্মসূচি ভিত্তিক যুগপৎ আন্দোলন জাতীয় ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বরাবরই বিভেদ রেখাকে জিইয়ে রাখে। যৌথ কর্মসূচি ভিত্তিক সম্মিলিত আন্দোলন বরাবরই আন্দোলনকে বহুধা বিভক্ত ও নেতৃত্বকে দুর্বল করে রাখে। পৃথক পৃথক দল ও মত বজায় রেখে যে কোন জোটবদ্ধ আন্দোলন কখনোই দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী থাকতে ও ইস্পাত-কঠিন ঐক্যে টিকে থাকতে পারে না। তাই যে কোন আন্দোলন-সংগ্রামকে তার বিজয়ের দাঁড়প্রান্তে নিতে হলে অবশ্যই একমুখী হতে হয়, একক সংগঠনের নেতৃত্বে সকল প্রকার ও সকল পক্ষের শক্তিকে সুসংহত করতে হয়, সর্বোপরি একই ধারার নেতৃত্বের অধীনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে একাট্টা করতে হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও মতের স্বতন্ত্র কার্যক্রম, কর্মসূচি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে অবদান রাখতে হবে।

এধরনের ঐক্য-সংহতি হয়তো কেউ কেউ অসম্ভব বলে বিবেচনা করতে পারে, তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে, সর্বোপরি জাতীয় অস্তিত্বের বিদ্যমান চরম সংকটের বাস্তবতাকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে তা কখনোই অসম্ভব বলে বিবেচনা করা যায় না। জুম্ম জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামের গোড়া থেকে যেভাবে সকল প্রকার বিভেদকামিতাকে বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখা সম্ভব হয়েছে সেই গৌরবময় সফলতা ও অর্জনকে যদি দ্বিধা-বিভক্ত শক্তিগুলো বিবেচনায় রাখে এবং প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে তা সহজেই অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অবশ্যই সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সকল পক্ষকে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আদিবাসী সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নির্দেশনা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

॥ মঙ্গল কুমার চাকমা ॥

গত ১৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ অধিশাখা থেকে "সংবিধান সম্মত শব্দচয়ন ও তথাকথিত আদিবাসী দাবীর কর্মসূচি পালনে স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে" শীর্ষক এক উদ্ভট, হাস্যকর ও অগণতান্ত্রিক নির্দেশনা জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো: মনিরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে যে, "সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ছোট ছোট সম্প্রদায়/গোষ্ঠীকে উপজাতি/ক্ষুদ্র জাতিসত্তা/নৃগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একটি স্বার্থান্বেষী মহল দেশী-বিদেশীদের সহায়তায় বাংলাদেশে আদিবাসী নামক অসাংবিধানিক দাবীটি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এই অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক শহর কেন্দ্রীক বিশেষ করে ঢাকা মহানগরের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা/অবকাঠামো যেমন: যুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় শহীদ মিনার, শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটসহ আরো অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কর্মসূচী পালনের জন্য ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করার প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। পত্রে বাংলাদেশে আদিবাসী নামক অসাংবিধানিক দাবী বাস্তবায়নের অপকৌশল রোধকল্পে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো, জাতীয় ঐতিহাসিক স্থান ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ করা হয়েছে।" বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পর সংবিধানে উল্লেখ নেই এমন শব্দ ব্যবহার বা দাবিদাওয়ার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ বা নির্দেশনা জারি হয়েছে বলে জানা যায়নি। শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে সম্ভবত এটাই প্রথম এ ধরনের উদ্ভট নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশনা স্বয়ং সংবিধান ও সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা, ৩৭ নং অনুচ্ছেদে সমাবেশের স্বাধীনতা, ৩৮ নং অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতার নিশ্চিয়তার বিধান করা হয়েছে। বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সংবিধানে কোথাও উল্লেখ নেই যে, কেবল সংবিধান সম্মত শব্দচয়ন করতে হবে বা সংবিধানের উল্লেখ নেই এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি সংবিধানের স্বীকৃত নয় এমন কোন দাবিদাওয়া উত্থাপন বা বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না বলে সংবিধানে কোথাও সেরকম বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের (২) দফায় নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের ক্ষেত্রে "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ" থাকলেও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন শব্দচয়ন এবং ব্যবহার করা যাবে না বা দাবিদাওয়া বাস্তবায়নের কথা বলা যাবে না বলে উল্লেখ নেই।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সংবিধানে 'দলিত', 'সংখ্যালঘু', 'অউপজাতীয়', 'প্রতিবন্ধী' ইত্যাদি শব্দসহ বাংলা ভাষার অনেক শব্দের উল্লেখ নেই। 'দলিত', 'সংখ্যালঘু' 'প্রতিবন্ধী' ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে এককথায় "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ" এই শব্দগুলো ব্যবহার না করে 'দলিত', 'সংখ্যালঘু', প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শব্দগুলো নানাভাবে বিভিন্ন আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এসব জনবর্গের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় শহীদ মিনার, শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটসহ আরো অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তো সেসব শব্দ ব্যবহারের উপর কোন বিধি-নিষেধ জারি করে নাই? পঞ্চদশ সংবিধানের মাধ্যমে "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" শব্দগুলো উল্লেখ করা হলেও সংবিধানে কোথাও উল্লেখ নেই 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি আইন জারি করেও কোথাও এসব শব্দ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী" বলা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে বাঙালিদেরকে 'অউপজাতীয়' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু এই অসাংবিধানিক শব্দ নিয়ে তো সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো টু শব্দও উচ্চারণ করছে না। তাহলে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অতি উৎসাহী বা অতি উদ্যোগী হয়ে আদিবাসী শব্দ ও দাবিদাওয়ার উপর এই উদ্ভট, হাস্যকর ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী নির্দেশনা জারি করলো কেন?

দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নানা প্রতিবেদন দিতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে সেই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হলেও কি সরকার বা সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো কোন বাছ-বিচার ছাড়াই তামিল করতে বাধ্য হবে? গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কত শত প্রতিবেদন নি:সন্দেহে রয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের বিষয় নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো টু শব্দটি উচ্চারণ করলেই মন্ত্রণালয়গুলো তথা সরকার এত হন্তদন্ত হয়ে নির্দেশনা জারির মহাযজ্ঞে নেমে পড়ে। অতি উৎসাহী তৎপরতার পেছনে একটা অত্যন্ত হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে বলে নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে। ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী জনসংখ্যায় ক্ষুদ্র এসব জাতিসমূহ সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক, দুর্বল ও অসহায় হিসেবে হয়তো বিবেচনা করা যায় বলে এবং যার

ফলে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে তাদের নিয়ে 'পান থেকে চুন খসে' পড়ার শব্দ উচ্চারিত হলেই মন্ত্রণালয়গুলোর মহাযজ্ঞে মেতে উঠা সহজতর বলে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মতো উদ্ভট, হাস্যকর ও অগণতান্ত্রিক নির্দেশনা দিতে সরকার উঠে পড়ে বলে বিবেচনা করা যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে 'উপজাতি' শব্দের পাশাপাশি 'আদিবাসী', 'indigenous hillmen', 'aboriginals' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনে 'aboriginals' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ আদিবাসী বা আদি বাসিন্দা। ১৯৯৫ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত ১২নং আইনে এবং এ আইনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ জুলাই ১৯৯৫ জারিকৃত সরকারি পরিপত্রেও 'আদিবাসী পাহাড়ী' (indigenous hillmen) উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে ২০০২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পরিপত্রে একটি প্রকল্প কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতিমালায় আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা কর্তৃক স্মারক নং সংস্থাপন (এডি-২)-৩৯/৯১-১৪৩ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ মূলে আইএলও'র আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কনভেনশন কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রেও 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয় যে, "চট্টগ্রামে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতির জন্য চাকুরির বয়স-সীমা স্বাভাবিক বয়স-সীমার তুলনায় ১০ বৎসর এবং শ্রমসাধ্য কর্মের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিল করা হইয়াছে।" কিন্তু কই, ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে প্রায় ৪০ বছর ধরে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা চরম হুমকির মধ্যে পড়েছে বলে তো জানা যায়নি। দেশে প্রচলিত উল্লেখিত আইনে ও পরিপত্রে যে 'উপজাতি', 'আদিবাসী', 'indigenous hillmen', 'aboriginals' শব্দগুলোর উল্লেখ রয়েছে তার পেছনে অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৯৫৭ সালের আদিবাসী ও উপজাতি সংক্রান্ত ১০৭ নং কনভেনশন যা বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে অনুস্বাক্ষর করে। সরকার যদি আদিবাসী শব্দটি অসাংবিধানিক আখ্যায়িত করত: সেই শব্দ ব্যবহারে বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১০৭ নং কনভেনশনকেও কি সরকার অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করবে? উক্ত কনভেনশনটি ১৯৭২ সালে অনুস্বাক্ষরের সময় তো 'আদিবাসী' শব্দটি বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বা reservation রেখে অনুস্বাক্ষর করা হয়নি। উক্ত কনভেনশনটি অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এটি দেশের আইনের নৈতিক ভিত্তি লাভ করেছে। অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এই কনভেনশনের অধিকারগুলো জাতীয় আইনগুলোতে সন্নিবেশকরণে সরকারের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

সরকারের আরেকটি বিষয় স্পষ্ট জানা থাকার কথা যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আদিবাসী ও ট্রাইবাল সংক্রান্ত কনভেনশনে উপজাতি ও আদিবাসী নির্বিশেষে বা আদিবাসী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত নির্বিশেষে এই কনভেনশন প্রযোজ্য হবে বলে বিধান রয়েছে। অর্থাৎ উপজাতি আখ্যায়িত করলে আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য অধিকারগুলোর প্রতি সরকারের সম্মান প্রদর্শন, সুরক্ষা প্রদান ও পরিপূরণ করতে হবে না এমনটা ভাবার কোন অবকাশ নেই। আন্তর্জাতিক আইনে বিভিন্ন দেশে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, পশুপালক জনগোষ্ঠী, যাযাবর জনগোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী, জনজাতি যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এবং সেসব জাতিগোষ্ঠীর আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকুক বা না থাকুক তাদের সকল জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারগুলো সেসব জনগোষ্ঠীর উপভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং মন্ত্রণালয়গুলো বা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বোকার স্বর্গে বাস করলে হবে না। এশিয়া মহাদেশে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, নেপাল, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ যদি এসব জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে ও তাদের অধিকার স্বীকৃতি প্রদানে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং এতে করে দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অধিকার বা নাগরিকত্ব ও জাতিগত পরিচিতির ব্যত্যয় না ঘটে থাকলে, সর্বোপরি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার ক্ষতি না হলে তাহলে বাংলাদেশের ৯৮.২% সংখ্যাগুরু বাঙালির অধিকার বা নাগরিকত্ব ও জাতিগত পরিচিতি বা জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা নিয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন অবকাশ আছে বলে ভাবা যায় না। আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর যতই যুক্তি অবতাড়না করা হোক না কেন তার পেছনে মূল কারণটা হলো বর্ণবাদী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহৎ জাতির জাত্যাভিমান এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বর্তমান বিশ্বে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ বিনির্মাণের প্রয়াস চলছে। রাষ্ট্র, সমাজ সকল ক্ষেত্রে ছোট-বড় সকল জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিকরণ বা অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও সুযোগ তৈরির কাজ চলেছে। কাউকে দূরে ঠেলে দিয়ে বা কাউকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ, সমতা ভিত্তিক সমাজ, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণ করা যায় না। অতি সম্প্রতি জাতিসংঘের গৃহীত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়ও 'কাউকে পেছনে না রাখা'র স্পিরিটকে ভিত্তি হিসেবে বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রণীত হয়েছে। আর বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো এসডিজি বাস্তবায়নেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল একটি রাষ্ট্রের পক্ষে মাত্র ১.৮% জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রদানে কোন প্রকার কার্পণ্য না দেখিয়ে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর এগিয়ে আসা উচিত বলে দেশবাসী কামনা করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বনজ ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংস প্রসঙ্গে

॥ চিংলামং চাক ॥

সুজলা সুফলা শস্যে ভরা ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল বিশিষ্ট বাংলাদেশ। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের এক দশমাংশ ৫০৯৩ বর্গমাইল পার্বত্য চট্টগ্রামেও অসংখ্য ঝর্ণা, পাহাড়-পর্বত, নদী, কৃত্রিম হ্রদ, বন-জঙ্গল, হরেক রকম প্রাণী এবং অপরূপ সৌন্দর্য্য। কিন্তু আজ সেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বন-জঙ্গল নেই, গাছ-পালা নেই। সব পাহাড়-পর্বত ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে সেই শত বছরের আগে থাকা বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতি, ধনেশ পাখি, ময়ুর ইত্যাদি শত রকমের পশুপক্ষি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রশ্ন জাগে, এই পরিণতির জন্য দায়ী কে? পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও আদিবাসীদের সহজ-সরল জীবনধারা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি, প্রথা, রীতি-নীতি ও পদ্ধতি যদি জানা না থাকে তাহলে উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আদিবাসীদের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন- সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংক্রান্ত ওয়ার্কসপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে জুমচাষকে দায়ী করার প্রবণতা থাকে। অথচ তাদের কাছে আদিবাসী পাহাড়িরা কীভাবে জুমচাষ করে এবং জুমচাষের পদ্ধতি সম্পর্কে মোটেই ধারণা নেই। অপরদিকে জেনে-শুনেও অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আদিবাসীদের উপর গায়ের জোরে দায় চাপিয়ে দিতে চায়; চাপিয়ে দিতে চায় তাদের সেই প্রকল্প বাস্তবায়ন ও স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে। অনেকেই জানেন যে, জুমচাষের পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেক বছর একই জায়গার উপর জুমচাষ করা হয় না এবং জুমচাষের পরবর্তী বছরে সেই জুমে পুনরায় বন-জঙ্গল হয়ে যায়। জুমচাষ হচ্ছে এক প্রকার মানুষের মাথা ন্যাড়া করার পর যেমনি পুনরায় মাথার চুল গজায় ঠিক একই রূপ হচ্ছে জুমচাষ।

প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িদের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে আসা যাক। মং সার্কেল, চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও ফরেস্ট সার্কেল (সংরক্ষিত বনাঞ্চল)–এই চারটি সার্কেল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। অপরদিকে প্রত্যেকটি সার্কেলে মৌজা ভিত্তিক বিভাজন করা হয়েছে। যেখানে একটি মৌজায় একজন হেডম্যান কর্তৃক মৌজার ভূমি পরিচালিত হয়। মং সার্কেলে ১২১টি মৌজা, চাকমা সার্কেলে ১৫৯টি মৌজা ও বোমাং সার্কেলে ৯৫টি মৌজা রয়েছে। মৌজার হেডম্যান সরাসরি সরকার নিয়োগ করতে পারে না। মৌজার অধিকাংশ প্রজা যাকে যোগ্য মনে করেন তিনি সার্কেল চীফ সুপারিশের মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মৌজা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সার্কেল চীফের সুপারিশ ব্যতিরেকে ডেপুটি কমিশনারের সরাসরি কাউকে হেডম্যান হিসেবে মৌজা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করার এখতিয়ার নেই। অপরদিকে প্রত্যেক গ্রামে এক বা একের অধিক গ্রাম প্রধান কার্বারী থাকেন। কার্বারীরা হেডম্যান ও সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি প্রকারের মধ্যে "খাস" শব্দ নেই। সকল প্রকার ভূমি হচ্ছে জুমভূমি ও মৌজার ভূমি। যাহা সমস্তিগত ও সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মৌজার প্রজা কেউ নিজের ইচ্ছামত শৃঙ্খলার বাইরে মৌজার ভূমি মালিকানা হওয়ার অধিকার নেই। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জমিদারী প্রথা ছিল না। ১৯৫০ সালের প্রজাসত্ব ও জমিদারী উচ্ছেদ আইন কর্তৃক যখন জমিদারী উচ্ছেদ করে সকল প্রকার ভূমি রাষ্ট্রের মালিকানার আওতাভুক্ত করা হয় তখনই "খাস" শব্দ সংযোজিত হয়।

'খাস' শব্দ হচ্ছে একটি ফরাসী শব্দ, যার অর্থ হলো সরকারি জমি বা সরকারের নিজস্ব জমি। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি প্রকার খাস হতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪টি আদিবাসী পাহাড়ি প্রথাগত রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমি মালিকানা ভোগ করে থাকে। এই ভূমি মালিকানার জন্য বন্দোবস্ত ও কাগজ-পত্র প্রয়োজন হয় না। এই আদিবাসী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িদের এই সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগ যুগ ধরে প্রথাগতভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছে এবং প্রথাগত নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমনঃ (১) ভূমির মালিকানা সামাজিক (সমষ্টিগত), (২) অবিক্রয়যোগ্য, (৩) মৌখিক, (৪) অঞ্চল, (৫) দখলসত্ব-ভোগদখল, (৬) পূর্বানুমোদন, (৭) শক্তিশালী নীতিবোধ, (৮) শক্তিশালী শৃঙ্খলাবোধ। এইসব নীতিমালার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িদের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি অধিকার ভোগ করে থাকে। প্রথাগত আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্ত ও মালিকানার ক্ষেত্রে মৌজা প্রধানের সুপারিশ বাধ্যতামূলক। শক্তিশালী নীতিবোধ ও শক্তিশালী শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে জুমভূমি, শ্মশানভূমি, পাড়াবন, মৌজা বন, গোচারণ ভূমি, গ্রাম ভূমি ইত্যাদি বনজ সম্পদ রক্ষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য রীতি। আদিবাসী পাহাড়িরা অপ্রয়োজনে বনজ সম্পদ বা গাছ-বাঁশ কর্তন করে না এবং ছড়া-নদী থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী মাছ, শামুক ইত্যাদি শিকার করে থাকে। অপরদিকে বিভিন্ন প্রকার বড় বড় গাছ-পালা, পাথর, পাহাড়কে কেন্দ্র করে পুজা পার্বন করে থাকে যার যার বিশ্বাস মতে। সুতরাং আদিবাসী পাহাড়িদের কাছে বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, নদী-ছড়া ইত্যাদি হচ্ছে মায়ের সমতুল্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগ্রামকালে পার্টির সিদ্ধান্ত এবং প্রয়াত নেতা এম এন লারমার পার্টি কর্মীদের নিকট নির্দেশনা ছিল অপ্রয়োজনে কেউ যেন বনজ ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংস না করে। একইরূপভাবে গ্রামে গ্রামে আদিবাসী পাহাড়িদের উপর বনজ ও প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের নির্দেশনা

দিতেন ও সচেতনতা গড়ে তুলতেন। জনৈক শান্তিবাহিনীর সদস্যের নিকট শুনেছি, একদিন এক কর্মী জঙ্গল থেকে পাওয়া কচ্ছপ রান্না করে খাওয়ার জন্য ব্যারাকে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রয়াত নেতা এম এন লারমা সেই কুড়িয়ে পাওয়া কচ্ছপ শেষ পর্যন্ত রান্না করে খেতে দেয়নি এবং কচ্ছপের পিঠে লাল রঙের চিহ্ন এঁকে দিয়ে জঙ্গলে পুনরায় ছেড়ে দেন। সেই লাল রঙের চিহ্নকৃত কচ্ছপটিকে অনেক বছর ধরে জঙ্গলে দেখা গিয়েছিল। মূলতঃ রাষ্ট্রই সুপরিকল্পিতভাবে বনজ ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংস করে। কারণ আদিবাসী পাহাড়িদের জীবন- জীবিকার প্রধান পেশা হচ্ছে জুমচাষ এবং তারা বন-জঙ্গল, ছড়া-নদী থেকে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি ও মাছ, শামুক সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্দোলন সংগ্রাম ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যসহ আদিবাসী পাহাড়িদের জুমচাষ ও জীবনধারাকে ধুলিসাৎ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রই সুপরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ধ্বংস করেছে। অপরদিকে সকল প্রকার ভূমি বিভিন্নভাবে কেড়ে নিয়েছে। এবার, রাষ্ট্র কীভাবে বনজ ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংস করেছে এবং সকল প্রকার ভূমি কেড়ে নিয়েছে তার কিছু উদাহরণ দেয়া গেল। যেমনঃ জিয়াউর রহমান ও এরশাদ আমলে (১) সহজ-সরল পাহাড়িদেরকে ডেকে ডেকে তিন জেলা প্রশাসক কর্তৃক ফ্রি পারমিট প্রদান করে বহিরাগত ধনী কাঠ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সকল প্রকার জঙ্গলে গাছ-বাঁশ ও পাথর সমতল অঞ্চলে পাচার করা হয়। (২) আশি হাজার সেটেলার পরিবার ও চার লক্ষাধিক সেটেলারকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জমি মোট ৯ লক্ষ ২০ হাজার একর ভূমি প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়। সেই সেটেলারগণ পাহাড়িদের গ্রামে অগ্নি সংযোগ, লুটপাট ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে ধান্য জমি জোর পূর্বক কেড়ে নেয়। অপর দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিপরীতে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার প্রক্রিয়া পাকাপোক্ত হতে থাকে। যার প্রমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

সাল	জুম্মদের সংখ্যা	বাঙালিদের সংখ্যা
১৯৪১	৯৭.০৬%	২.৯৪%
১৯৫১	৯৩.৭১%	৬.২৯%
১৯৬১	৮৮.২৩%	১১.৭৭%
১৯৭৪	৭৭.১৬%	২২.৮৪%
১৯৮১	৬৮.৫২%	৪১.৪৮%
১৯৯১	৫১.৪৩%	৪৮.৫৭%
২০১১	৫২.৯০%	৪৭.১০%

(৩) বন বিভাগ কর্তৃক বনায়নের নামে কেবলমাত্র বান্দরবানে ১,১৮,০০০ একর। (৪) রাবার প্লান্টেশন ও হর্টিকালচার কেবলমাত্র বান্দরবানে ৫০ হাজার একরের অধিক। (৫) অভয়ারণ্য সৃষ্টির জন্য শত শত একর। (৬) শান্তিবাহিনী ও পাহাড়িদেরকে দমনের জন্য এবং পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে ৫ শতাধিক সেনা ছাউনি স্থাপনের মাধ্যমে ৩ হাজার একরের অধিক ভূমি দখল করা হয়। (৭) সরকারী-বেসরকারী আমলা, ব্যক্তি, কোম্পানি, পর্যটন ইত্যাদির নামে হাজার হাজার একর জুম ভূমি কেড়ে নেয়া হয় এবং এসব কার্যক্রমের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সৌন্দর্য্য, পাহাড়, পর্বত, বন-জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়। বন যেখানে থাকবে না সেখানে প্রাণীর বেঁচে থাকার পরিবেশ থাকতে পারে না। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে মধ্যে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ অবধি বাস্তবায়ন না করে সরকার আদিবাসী পাহাড়িদের সাথে প্রতারণা করছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করে চুক্তি লংঘন করে চলেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক এসব প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের শিকার ও ভুক্তভোগী হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি জনগণ। আজ পাহাড়ি আদিবাসীরা নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পরবাসী ও মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। জুম চাষের জুমভূমি নেই, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই। অধিকাংশ পাহাড়ি আদিবাসী আজ দিন মজুর, বড় বড় কোম্পানির কাছে রাবার শ্রমিক, কলকারখানা শ্রমিকে পরিণত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য যদি পাহাড়ি আদিবাসীদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কী করে শান্তি আসবে? সেই প্রশ্ন আজ পার্বত্যবাসীর।

এদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা চিত্র আমরা আজ হারাতে বসেছি। আমাদের দেশে সুন্দরবন ব্যতীত আর কোথাও বন-জঙ্গল নেই। কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশে চাষ উপযোগী জমির উপর যেভাবে কলকারখানা, ব্রীকফিল্ড, হাউজিং সোসাইটি, মৎস্য চাষ, নগর, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, পর্যটন, পেট্রোল ও গ্যাস পাম্প, মার্কেট ইত্যাদি গড়ে উঠছে–সেভাবে চলতে থাকলে আগামী ৪০-৫০ বৎসরে কৃষি চাষের চাষযোগ্য জমি আর থাকবে না। তখন সুফলা-সুজলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ কি থাকবে? সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে জন জীবনের উপর প্রভাব পড়ছে। তাই এখন বড় প্রশ্ন- পৃথিবীতে মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকবে তার উপায় খুঁজছে। জাতিসংঘ ও বিশ্বের উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অনেক কাজ করে যাচ্ছে। অথচ আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশে হাহাকার অবস্থা। নদী-ছড়া, খাল-বিলে পানি নেই, বন-জঙ্গল নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বনবিভাগ কর্তৃক সামাজিক বনায়ন করা হয়। আসলে কি বনায়ন? পাহাড়ি আদিবাসীদের জুমভূমি, মৌজাভূমি, পাড়া বনের উপর বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা, বন-জঙ্গল ধ্বংস করে সেগুন, গামারি, আকাশ মনি, আগর, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি গাছ-পালার বাগান সৃজন করা হয়ে থাকে। সত্যিকার অর্থে বনবিভাগ সামাজিক বনায়ন নামে সকল প্রকার বন-জঙ্গল ধ্বংস করে থাকে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ও প্রাণী সম্পদ ধ্বংসের জন্য রাষ্ট্র দায়ী নয় কি?

প্রদীপ জ্বালাও

॥ বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ॥

মোহ ঘুমে অচেতন ছিল জুম্ম জাতি বিশ্বের অঙ্গণে
কে জাগাল তারে আকস্মাৎ–মহাজীবনের আহ্বানে?
কে শোনাল সবার প্রথম মুক্তির জয়গান,
জুম্ম জাতিরে কে দিল প্রথম মানুষের সম্মান?
এ জাতির মুক্তির স্বপ্নে সব কিছু দিয়ে বিসর্জন,
অন্তহীন যাত্রাপথে বেছে নিল সংগ্রামী জীবন?
মুক্ত করি এ দেশের প্রতি ধুলিকণা–
জুম্ম জাতির সুখী সমৃদ্ধ সংসার করিতে রচনা।
কঠোর সংগ্রামে যে পুরুষ দিল আত্ম-বিসর্জন,
সেই যে মহান ব্যক্তি বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ!
ঐ দেখ তার পূত দেহ প্রশান্ত আবেশে–
সংগ্রামী এ দেশের প্রতি ধুলিকণায় গেছে মিছে!
সবুজ ঘাসের বেদী ধরণীর অফুরন্ত ধন,
উন্মুক্ত গগণেতে রচে তার রত্ন সিংহাসন!
এ আসন পূণ্য তীর্থ জুম্মদের মহাতীর্থ স্থান,
প্রদীপ জ্বালাও সেথা– উদ্ভাসিত হোক মুক্তির বিতান।

বি:দ্রঃ এই কবিতাটি ১৯৮৪ সনের ১০ নভেম্বর এম এন লারমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত '১০ই নভেম্বর স্মরণে' প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় "শ্রী তঞ্চঙ্গ্যা" ছদ্ম নামে। এবারে কবির আসল নামে প্রকাশ করা হলো। – তপ্রবি

অসহযোগ আন্দোলন জোরালোভাবে এগিয়ে চলছে

কালো পতাকা মিছিল, ক্লাস বর্জন ও ছাত্র ধর্মঘট, অফিস-আদালত বর্জন, বিক্ষোভ মিছিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি কর্মসূচি সফলভাবে পালিত

কালো পতাকা মিছিল, ক্লাস বর্জন ও ছাত্র ধর্মঘট, অফিস-আদালত বর্জন, বিক্ষোভ মিছিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি কর্মসূচি সফলভাবে পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া এবং সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অসহযোগ আন্দোলন জোরালোভাবে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, হাট-বাজার বর্জন, কালো পতাকা মিছিল, কাস বর্জন ও ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র-যুব সমাবেশ, প্রতীকী অনশন ধর্মঘট, অফিস-আদালত বর্জন, স্মারকলিপি প্রদান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি কর্মসূচি আপামর জনগণের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থনে ও অংশগ্রহণে সফলভাবে পালিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার চরম ফ্যাসীবাদী ভূমিকা নিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় ১৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকরকরণ; আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন, পরিবেশ, স্থানীয় পুলিশ ইত্যাদি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরকরণ এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ ও তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিলকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ; ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে।

আরো উল্লেখ্য যে, আপামর জুম্ম জনগণসহ দেশে-বিদেশে প্রবল দাবি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকার চরম উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে চলেছে। সরকারের পক্ষ থেকে 'চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে' বা 'চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক', '৮০% চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে', কখনো বা 'এ সরকারের আমলে ৯০% চুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে' ইত্যাদি বুলি আওড়িয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে যথাযথ ও দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ ১৩-দফার ভিত্তিতে সংশোধনের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সরকার উক্ত আইন সংশোধনে অব্যাহতভাবে কালক্ষেপণ করে চলেছে। অপরদিকে সরকার চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পেশীশক্তি দিয়ে জোর করে সরকার বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। জনমতের বিপরীতে অর্ন্তবর্তী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ থেকে ১৫ জনে বৃদ্ধি করে অগণতান্ত্রিক ও দলীয়করণের ধারা আরো

জোরদার করা হয়েছে। চরম দুর্নীতি, অনিয়ম ও দলীয়করণের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থাকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে পদদলিত করে জুম্মদের মৌজা ও জুম ভূমির উপর সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে শত শত একর ভূমি ইজারা প্রদান করে এবং পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা করে জুম্মদেরকে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। দেশে-বিদেশে প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের ভ্রমণে ও জুম্মদের সাথে বিদেশী/দেশীয় সংস্থার লোকজনের সাক্ষাতে বিধি-নিষেধ আরোপ, পাহাড়ি পুলিশ সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমতল অঞ্চলে বদলিসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও বর্ণবাদী নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে কালো পতাকা মিছিল

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও নারীর উপর সহিংসতা বন্ধের দাবি

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও নারীর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ এবং প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরা হয়–

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নে সময়সূচি ভিত্তিক কার্যকর কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা;

২. অনতিবিলম্বে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন-২০০১ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৩. অবিলম্বে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত করা;

৪. জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিসহ দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারসমূহের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জত ও বহু মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাক্ষরিত হওয়া এবং জুম্ম জনগণসহ স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকারের সনদ এই চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে যে সংকট সৃষ্টি হবে তার জন্য সরকারই দায়ী থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া এবং সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করার লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের যে চলমান অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে, চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে এর মাত্রা তীব্র হতে তীব্রতর করা হবে।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, একদিকে সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করছে না, চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করছে না, অথচ বিজিবি ক্যাম্প, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়নের নামে জুম্মদের ভূমি বেদখল করছে, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার হালকে বেহাল অবস্থায় রেখেছে– এমনি বাস্তবতায় সরকার জোর করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জুম্ম জনগণের উপর রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প চাপিয়ে দিতে চাইছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও দিন দিন চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ববর্তী সময়ের মতই জুম্ম নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণেই এই সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি জেলা সদর ছাড়াও জেলার বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি ও কাউখালি উপজেলায় এই কালো পতাকা মিছিল, সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয়। অপরদিকে বান্দরবান জেলা সদর ছাড়াও বান্দরবানের রুমা উপজেলায় একই দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি রুমা থানা শাখার উদ্যোগে কালো পতাকা মিছিল বের করা হয়।

পিসিপি ও যুব সমিতির বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিসহ পার্বত্য জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগসহ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত করার দাবি

শিক্ষক নিয়োগসহ পার্বত্য জেলা পরিষদের সকল দুর্নীতি বন্ধ ও রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিতের দাবীতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে স্মারকলিপি প্রদান, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পেশকৃত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, দিনে দিনে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। চরম দলীয়করণ, অনিয়ম, কায়েমী স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, চুক্তি পরিপন্থী ভূমিকার কারণে এসব পরিষদসমূহ আজ প্রায় গণবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে, এসব পরিষদসমূহ কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ ও অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান বেহাল অবস্থায় উপনীত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জনগণের বিভিন্ন মহল থেকে এব্যাপারে সরকারের নিকট বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এবং প্রতিবিধানের দাবি জানানো হলেও সরকার এপর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সম্প্রতি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক রাঙ্গামাটির ১০ উপজেলায় ৩২৫ জন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগেও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে না হওয়ায় রাঙ্গামাটি জেলায় উক্ত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রাখার জন্য গত ৩১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে অবগত করে চিঠি পাঠান। তা সত্ত্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

অপরদিকে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রনেন বিকাশ চাকমা নামের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার এক বাসিন্দা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এস এন গোস্বামীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট আবেদন দাখিল করেছেন। আদালত আগামী ১০ নভেম্বর ২০১৫ এই রিট আবেদনের শুনানীর দিন ধার্য করেছেন। এছাড়া ইতোমধ্যে ভুক্তভোগী জনগণের পক্ষ থেকে – এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভূয়া স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিয়ে নিয়োগ পাওয়া, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ভুক্ত নয় এমন প্রার্থীকে ত্রিপুরা কোটায় নিয়োগ দেওয়া, খিয়াং সম্প্রদায়ের কোটার সুযোগ থাকলেও সেই সুযোগ না দেওয়া, রাঙ্গামাটি সদরের কোটায় কেবল পৌর এলাকার প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া, কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজসে জনৈক প্রার্থীকে পরীক্ষায় সহযোগিতার জন্য বরকল উপজেলার এক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা, বহিরাগত প্রার্থীদের নিয়োগ দানে সুযোগ দেয়া ইত্যাদি বহু গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ কর্তৃক এভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি চলতে থাকলে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার মেরুদন্ড অচিরেই যেমনি ভেঙে পড়বে, তেমনি এ অঞ্চলের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গভীর সংকটের সৃষ্টি করবে এবং নেতিবাচক মূল্যবোধের জন্ম দেবে।

অন্যান্যের মধ্যে অবিলম্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ যথাযথ তদন্ত পূর্বক দোষীদের শাস্তি বিধানসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে

পিসিপির ডাকা ছাত্র ধর্মঘট এবং মানববন্ধন ও সমাবেশ কর্মসূচি সফলভাবে পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কর্তৃক ৭ অক্টোবর ২০১৫ তিন পার্বত্য জেলায় ক্লাস বর্জন ও ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচি এবং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশ কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার অধিকাংশ উপজেলায় ও প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচি ব্যাপকভাবে পালিত হয়। অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলার ছাত্র ধর্মঘট ছাড়াও এই ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে রাজধানী ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে মানববন্ধন ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

তিন পার্বত্য জেলার উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজ বর্জন করে ছাত্র ধর্মঘটে সামিল হয়। অপরদিকে রাঙ্গামাটি সদরের একটি বেসরকারী স্কুল এন্ড কলেজ বাদে রাঙ্গামাটি জেলা সদরসহ বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সদরের প্রায় ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে যাওয়া

থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলার এই ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে সকালের দিকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রাজু ভাস্কর্যের সামনে এক ছাত্র-সমাবেশের আয়োজন করে। পাশাপাশি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও সমাবেশ এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম প্রেসকাবের সামনে সমাবেশ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারে মানববন্ধন ও সমাবেশের আয়োজন করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর ষড়যন্ত্রে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের উদ্বেগ প্রকাশ

যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে হুশিয়ারি

পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর ছাত্র-জনতার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার নতুন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গত ১৪ অক্টোবর ২০১৫ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন অভিমত ব্যক্ত করেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষাকে বেহাল অবস্থায় রেখে, জুম্ম জনগণের অধিকার ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়ে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে সরকার রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ কখনোই মেনে নেয়া হবে না।

উক্ত সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা। অন্যানের মধ্যে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগনের মতামতকে উপেক্ষা করে সরকার বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামে অছাত্রদের দিয়ে সরকারের দলীয় লোক দিয়ে এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ক্লাস শুরু দাবিতে গত ১১ অক্টোবর ২০১৫ রাঙ্গামাটিতে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রলীগ ও কতিপয় ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠনের ছত্রছায়ায় ছাত্র নামধারী কতিপয় বহিরাগতদের দিয়ে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি-কার্যক্রম শুরু করার দাবিতে এক মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অশান্ত করার পাঁয়তারা করছে। এমন সাম্প্রদায়িক এবং উস্কানিমূলক কার্যক্রম করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আবারো অশান্ত হয়ে উঠবে।

বক্তারা আরো বলেন, জনমতের বিপরীতে গত ১০ জানুয়ারী ২০১৫ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষাকার্যক্রম উদ্বোধন করতে গিয়ে রাঙ্গামাটিতে মারাত্মক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে জনমত উপেক্ষা করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দিবানিশি প্রহরায় জোর করে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে, যা সার্বিক পরিস্থিতিকে ক্রমাগত অশান্ত করে তুলছে। এমন পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ছাত্র নামধারী কতিপয় বহিরাগতদের দিয়ে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার নতুন ষড়যন্ত্রের মেঠে উঠেছে। অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বরের শুরুর দিকে রাঙ্গামাটিস্থ রানী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় সরকার যদি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্যবাসীদের পক্ষ থেকে কঠোর কর্মসূচি ঘোষনার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা হবে। এজন্য যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন সুস্পষ্ট ভাষায় আরেকবার সরকারকে স্মরণ করে দিতে চায়।

অফিস-আদালত বর্জন কর্মসূচি সফলভাবে পালিত

স্বত:স্ফূর্তভাবে অফিস-আদালত বর্জন করায় আপামর জনগণকে জনসংহতি সমিতির ধন্যবাদ

চলমান অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আহ্বানে ২১ অক্টোবর ২০১৫, বুধবার, তিন পার্বত্য জেলায় সকল প্রকার অফিস-আদালত বর্জনের কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী অফিস, আদালত, ব্যাংক-বীমা-পরিষদীয় অফিসগুলোতে লোকজনের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত সাধারণ লোকজন এসব অফিস-আদালতে যাওয়া ও অফিস-আদালতের কাজ-কর্ম থেকে স্বত:স্ফূর্তভাবে বিরত থাকেন। জেলা ও উপজেলা সদরে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল থাকলেও অফিস-আদালত ছিল ফাঁকা এবং রাস্তা-ঘাটে যান চলাচল ছিল কম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা ও

৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার নতুন ষড়যন্ত্র: অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া এবং সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করার লক্ষ্যে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে, অপরদিকে সরকার যখন চুক্তি বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে চরম নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে চলেছে এবং যখন দেশের নাগরিক সমাজসহ জুম্ম জনগণের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষমতাসীন কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ হিসেবে গত ১১ অক্টোবর ২০১৫ রাঙ্গামাটিতে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রলীগ ও কতিপয় ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠনের ছত্রছায়ায় ছাত্র নামধারী কতিপয় বহিরাগতদের দিয়ে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি-কার্যক্রম শুরু করার দাবিতে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষাকে বেহাল অবস্থায় রেখে, জুম্ম জনগণের অধিকার ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়ে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে সরকার রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগে নিয়েছে। বলাবাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ পরিচালনা, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণকারী সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও কমিটি, ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসহ এখানকার স্থায়ী অধিবাসীদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী কোন ভূমিকাই রাখা হয়নি। এমতাবস্থায় এ দুটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে তা বর্তমান সময়ে পার্বত্যবাসীর উপকারের পরিবর্তে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বিধায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে আসছে।

উল্লেখ্য যে, জনমতের বিপরীতে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৫ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করতে গিয়ে রাঙ্গামাটিতে মারাত্মক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে জনমত উপেক্ষা করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দিবানিশি প্রহরায় জোর করে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে, যা সার্বিক পরিস্থিতিকে ক্রমাগত অশান্ত করে তুলছে। এমনি পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ছাত্র নামধারী কতিপয় বহিরাগতদের দিয়ে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি-কার্যক্রম শুরু করার নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। উক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত উপাচার্য প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমার বরাত দিয়ে এও জানা গেছে যে, অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বরের শুরুর দিকে রাঙামাটিস্থ রানী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হবে।

প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সরকার যদি পেশীশক্তি দিয়ে জোর করে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি-কার্যক্রম শুরু করে, তাহলে তার পরিণতি শুভ হতে পারে না। সকল ধরণের ত্যাগের বিনিময়ে জুম্ম ছাত্র-জনতা রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি-কার্যক্রম শুরু করার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন সুস্পষ্ট ভাষায় আরেকবার সরকারকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ আপামর জুম্ম ছাত্র-জনতা কখনোই মেনে নেবে না। এজন্য যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন সুস্পষ্ট ভাষায় আরেকবার সরকারকে স্মরণ করে দিতে চায়।

জানা গেছে যে, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে কম্পিউটার সায়েন্সে এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রথম ব্যাচে ৭৩ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। ১১ অক্টোবর ২০১৫ রাঙ্গামাটিতে মানববন্ধন শেষে অচিরেই শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার দাবিতে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ২০ জন ছাত্রের স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। যারা ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এই বিতর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন সেসব ছাত্রছাত্রী ভাইবোনদের উদ্দেশ্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ইতিমধ্যে আহ্বান জানিয়েছে যে, এই বিতর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার আপনাদের মতো নিরীহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহারের পাঁয়তারা করছে। এই রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নামে আপনাদের মতো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এটি শিক্ষার নামে সরকারের প্রহসন, শিক্ষার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র। এ জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক বাস্তবতাকে মূল্যায়ন করে সরকারের ষড়যন্ত্রে সামিল না হতে এবং রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বিরত থাকতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন তাদের প্রতি আহবান জানিয়েছে। এ দু'টি সংগঠন বিতর্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের সম্ভাবনাময় শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে না দিতে অনুরোধ করেছে। দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যাকে অন্তর দিয়ে বুঝার চেষ্টা করতে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর হীনষড়যন্ত্রকে সম্যকভাবে অধ্যয়ন করতে, সর্বোপরি জুম্ম জনগণের উপর চলমান বঞ্চনা ও অসন্তোষকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধির চেষ্টা করতে সংগঠন দু'টি আহ্বান জানিয়েছে। তাই বিতর্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ষড়যন্ত্র থেকে সরে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম ছাত্র সমাজ তথা পার্বত্যবাসীর ন্যায্য দাবির প্রতি সংহতি ও একাত্মতা প্রদর্শনে এগিয়ে আসতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত এসব ছাত্রছাত্রীদেরকে আহ্বান জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জরুরী সভা ও নাগরিক সমাজের বিরোধিতা

গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিতর্কিত রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সংক্রান্ত জরুরী সভা আহ্বান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত উপাচার্য ড. প্রদানেন্দু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন ও পুলিশের কর্মকর্তারা ছাড়াও রাঙ্গামাটি সুশীল সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কথা বললেও সুশীল সমাজের অনেক প্রতিনিধি জনমতের বিপরীতে বা প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে দ্বিমত পোষণ করেন। যারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বিরোধিতা করছেন তাদেরও যুক্তি রয়েছে বলে তারা জোরালো অভিমত তুলে ধরেন। এজন্য সর্বাগ্রে সকল পক্ষকে আস্থায় নিয়ে আসার উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি ও রাঙামাটি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন আইন করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু এই প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। ফলে এতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণকারী সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও কমিটি, ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্থায়ী অধিবাসীদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী কোন ভূমিকাই রাখা হয়নি বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও রাঙামাটি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মালিক লাল দেওয়ান বলেন, শিক্ষক হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করতে পারে না। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিরোধিতা এসেছে। তাদেরও একটি যুক্তি আছে। এগুলো বিবেচনা করা হোক। অপরদিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিরূপা দেওয়ান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একটি ভাল উদ্যোগ এটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে যে জনমত রয়েছে তারও একটা যৌক্তিকতা রয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকেও প্রাধান্য দিতে হবে বলে তিনি জানান।

ব্যবসায়ী মনিরুজ্জামান মহসিন বলেন, ১০ জানুয়ারি রাঙামাটি মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন নিয়ে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা আমরা কেউ কামনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করতে গিয়ে একই ধরনের সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি তা আমরা চাই না। তাই বিরোধ থাকলে তা আগে নিষ্পত্তি করার আহ্বান জানান। জাতীয় পার্টির নেতা হারুন মাতব্বর বলেন, মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে, কিন্তু তাতে স্থানীয় অধিবাসীদের কোটা তেমন একটা নেই। রাঙামাটিতে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই পার্বত্যবাসীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে

বলে তিনি জানান। সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি রাঙামাটি রিজিয়নের মেজর তসলিম তারেক নানা অযাচিত কথাবার্তা উত্থাপন করেন। যারা বিরোধিতা করছেন কেন তাদের কোন প্রতিনিধি সভায় নেই বলে সভায় প্রশ্ন তুলেন। অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা অবস্থাকে পেছনে নেয়া হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা বিরোধিতা দেখা যায় না বলে তিনি বাস্তব-বিবর্জিত বক্তব্য তুলে ধরেন। অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কথা বললেও শিক্ষক নিয়োগে চরম দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়ন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান থেকে তিনি সচতুরভাবে বিরত থাকেন। আর তাঁর কথায় বুঝা যায়, শিক্ষক নিয়োগে চরম দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ এবং চলমান আন্দোলন তাঁর চোখে দৃশ্যমান হয় না।

মেডিকেল কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম পুলিশ ও সেনা প্রহরায় পেশীশক্তির জোরে চালানো হচ্ছে

বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলা সদর হাসপাতালে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম জোর করে চালানো হচ্ছে। সেখানে পরিখা খনন করে সার্বক্ষণিক সেনা ও পুলিশ প্রহরা ও টহল বসিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলা সদর হাসপাতালের উক্ত অংশটি সেনা ও পুলিশ ছাউনিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকের অভাবে রাঙ্গামাটি হাসপাতালের চিকিৎসকদের দিয়ে ক্লাশ নেয়া হচ্ছে অভিযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ না থাকার ফলে, মেডিকেল কলেজ নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করার কারণে, সর্বোপরি সরকারের গণবিরোধী আচরণের প্রতি প্রতিবাদে কিছু ছাত্রছাত্রী মেডিকেল কলেজ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে বলেও জানা গেছে। এমনিতরভাবে স্থানীয় জনগণের প্রবল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সেনা-পুলিশ-প্রশাসনের পেশীশক্তি দিয়ে গলা চেপে ধরে জোর করে পার্বত্যবাসীকে তথাকথিত উন্নয়ন গেলানোর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ বিষয়ে ঢাকায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে পর পর চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি কে এস মং মারমা উপস্থিত ছিলেন। সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮ মার্চ ২০১৫। উক্ত সভাগুলোতে ঊষাতন তালুকদার এমপি ও কে এস মং মারমা কেন পার্বত্যবাসী এই মুহূর্তে রাঙ্গামাটিতে মেডিকেল কলেজ চায় না এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টি স্থাপনের উদ্যোগ কেন স্থগিত রাখা দরকার তার বস্তুনিষ্ট যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। তারই আলোকে ১৮ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সভায় উক্ত দু'জন প্রতিনিধি, বিশেষ করে সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত রাখার মতামত দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাঙ্গামাটিতে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত রাখার দাবি কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বিষয় নয়। এটা বিভিন্ন স্তরের পার্বত্যবাসীর দাবি এবং এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনগণের ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম আপাতত: স্থগিত রেখে উক্ত মেডিকেল কলেজে ভর্তি-হওয়া ছাত্রছাত্রীদের দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বন্টন করে দিয়ে সমন্বয় করার জন্য তিনি মতামত তুলে ধরেছিলেন। তাঁর উক্ত মতামতের সাথে উক্ত সভায় (১৮ মার্চ ২০১৫) উপস্থিত অনেকে সহমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত সভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার একতরফা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বর্তমানে জনমত উপেক্ষা করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দিবানিশি প্রহরায় জোর করে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে, যা সার্বিক পরিস্থিতিকে ক্রমাগত অশান্ত করে তুলছে।

---

৩৫ পৃষ্ঠার পর

অফিস-আদালত বর্জন কর্মসূচি সফলভাবে পালিত

সমর্থন জানিয়ে স্বত:স্ফুর্তভাবে অফিস-আদালত বর্জন করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলার আপামর জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়। জনসংহতি সমিতি আশা করে যে, চলমান অসহযোগ আন্দোলনের যে কোন কর্মসূচিতে পার্বত্যবাসীর এ ধরনের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

অফিস-আদালত বর্জনের কর্মসূচি চলাকালে সেনাবাহিনী বিভিন্ন অফিসে পরিদর্শন করে। জুরাছড়ি উপজেলায় যক্ষ্যাবাজার ক্যাম্পের কম্যাণ্ডার জনৈক সুবেদার জুরাছড়ি উপজেলা পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন করে 'কার সাহস আছে অফিস বর্জন করার' এমন হুমকি প্রদান করেন।

'যারা মরতে জানে তারা পৃথিবীতে অজেয়। যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পাহাড়ি ছাত্রদের উপর ছাত্রলীগ ও বহিরাগতদের হামলা, জুম্মদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং পাহাড়িদের মামলা গ্রহণে পুলিশের অস্বীকার

গত ১৭ অক্টোবর ২০১৫ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ছাত্রলীগ ও বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এ হামলার জেরে কলেজ গেইট ও ইউএনও অফিস সংলগ্ন এলাকায় বাঙালি দোকানদার ও সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর এলোপাতাড়িভাবে চড়াও হয়। এই হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন জুম্ম আহত হন। তাদের মধ্যে অমরসিন্ধু চাকমা, কমেশ চাকমা, পুলক চাকমা, অপু তালুকদার, এলিন চাকমা প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম পাওয়া গেছে।

জানা যায়, রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক শনিবার ছাত্র সংগঠনগুলো মিছিল ও সমাবেশ করার অনুমতি রয়েছে। প্রতি সপ্তাহের ন্যায় সেদিন শনিবারও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনসমূহ মিছিল বের করে। সেদিন যে স্থানে পিসিপি সমাবেশ করে সে স্থান ছাত্রলীগের কর্মীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে দখল করে নেয়। তা সত্ত্বেও কোন বিতর্ক বা ঝামেলায় না গিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ অন্যত্র সমাবেশ করে। সেদিন ছাত্রলীগের মিছিলে শামসুজ্জামান বাপ্পির নেতৃত্বে বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রসহ বহিরাগত কিছু যুবকও যোগদান করে। পিসিপির সমাবেশ শেষ হওয়ার পর পিসিপি কর্মীদের সাথে ছাত্রলীগের কর্মী সৌরভ ত্রিপুরা ও বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্র শামসুজ্জামান বাপ্পি অসৌজন্যমূলক আচরন করে। এতে পিসিপি কর্মীরা প্রতিবাদ করলে একপর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা শুরু করে। এ সময় ছাত্রলীগের সাথে কলেজ গেইট এলাকাস্থ দোকানদার ও বহিরাগত সেটেলাররাও হামলায় অংশগ্রহণ করে। তারা পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এসময় কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও হটের আঘাতে আহত হন বলে জানা যায়। একপর্যায়ে জুম্ম ছাত্ররা ছাত্রলীগ কর্মী ও বহিরাগতদের ধাওয়া করে কলেজের গেইটের বাইরে তাড়িয়ে দেয়।

একপর্যায়ে সেটেলার বাঙালিরা কলেজ গেইট ও ইউএনও অফিসের সামনে জুম্মদের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়। তারা ইউএনও অফিসের সামনে চাকরীজীবী অপু তালুকদারকে সিএনজি থেকে নামিয়ে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। হামলাকারী দুর্বৃত্তরা তার লেপটপ কম্পিউটার, ব্যাগ, পাসপোর্ট ও ৪০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে রাঙ্গামাটি সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ছাত্রলীগের কর্মী ও কতিপয় ব্যক্তি কলেজ গেইট সংলগ্ন দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট এবং পাহাড়ি সাধারণ ছাত্র কমেশ চাকমার গাড়িসহ দু'টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করা হয়।

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পিসিপির চলমান জোরালো আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের ছত্রছায়ায় ছাত্রলীগ কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছে বলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ উল্লেখ করেছে। বিনা উস্কানীতে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ছাত্রলীগের এই হামলার জন্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ হামলার সাথে জড়িত ছাত্রলীগ কর্মী ও বহিরাগত সেটেলারদের অচিরেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়েছে।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জরুরী সভা ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক সংবিধান বিরোধী নির্দেশনা জারি

ঘটনার জেরে ১৮ অক্টোবর জেলা প্রশাসক মো: শামসুল আরেফিনের আহ্বানে ও সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনে এক জরুরী আইন-শৃঙ্খলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসংহতি সমিতি, পিসিপি, ছাত্রলীগ, আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পুলিশ, জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনী-বিজিবি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের পরিবর্তে উস্কানীমূলক বক্তব্য এবং সংঘটিত ঘটনার মনগড়া ও বানোয়াট বর্ণনা প্রদান করেন। তারা কলেজ গেইটের একটি দোকান ভাংচুর ও একটি দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনার একতরফাভাবে পাহাড়ি ছাত্রদের দায়ি

করে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বক্তব্য প্রদান করেন। অপরদিকে সভায় অনেকে পূর্বেসংঘটিত সহিংস ঘটনার বিচার না হওয়ার কারণে এ ধরনের ঘটনা বার বার ঘটে চলেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ২০১২ সালে ২২ সেপ্টেম্বর সংঘটিত রাঙ্গামাটি সহিংস ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি বিচার না হওয়ার কথা অনেকে তুলে ধরেন। অনেকে বলেন, দেশের কলেজগুলোতে সাধারণত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এ ধরনের সংঘাত হয়ে থাকে। কিন্তু রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের বেলায় দেখা যায় যে, কলেজে কোন ঘটনা ঘটলেই কলেজ গেইটের দোকানদার ও সেটেলার বাঙালিরা আগ বাড়িয়ে সংঘাতে জড়িত হয়ে পড়ে এবং ছাত্রসংগঠনগুলোর সংঘাতকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে রূপান্তর করে থাকে। সুশীল সমাজের জনৈক প্রতিনিধি অভিযোগ করে বলেন, যার দোকান হামলার শিকার হয়েছে সেই দোকানদার নাকি প্রত্যেক ঘটনার সময় একটি কিরিচ নিয়ে জুম্মদের উপর চালাতে এগিয়ে আসে। সেসব সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সভার শেষপ্রান্তে জেলা প্রশাসক সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের জন্য আটটি প্রস্তাব পেশ করেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো- রাঙ্গামাটি শহরে কোনো সভা-সমাবেশ করতে চাইলে জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলোকে জেলা প্রশাসন থেকে অনুমতি নেয়া, রাঙামাটি সরকারি কলেজে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা বসানো, কলেজ ক্যাম্পাসের চারদিকে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইউনিফর্ম চালু করা ইত্যাদি।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার প্রেক্ষিতে এ সভা ডাকা হলেও রাঙ্গামাটি শহরে সভা-সমাবেশ আয়োজনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন থেকে অনুমতি নেয়ার প্রস্তাবে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বিরোধিতা করেন। অন্যান্যের মধ্যে জনসংহতি সমিতি ও পিসিপির প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, এযাবৎ প্রশাসনকে অবহিতকরণের মাধ্যমে রাঙ্গামাটিতে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিত সভা-সমাবেশ আয়োজনের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণের কোন সুযোগ থাকে না বলে তারা মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্বসম্মত ব্যতিরেকে জেলা প্রশাসক উক্ত প্রস্তাব সিদ্ধান্ত হিসেবে জানিয়ে দেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত এপ্রিল মাসে জারি করা পরিপত্রের নির্দেশ অনুসারে সভা-সমাবেশের জন্য অবশ্যই লিখিত অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু ২৩ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় উল্লেখ রয়েছে যে, "১।(ঙ) কোন দেশী/বিদেশী ব্যক্তি/সংস্থা পার্বত্য অঞ্চলে কোন সভা করতে চাইলে জেলা প্রশাসকের নিকট সভায় আলোচ্যসূচি, সভার তারিখ, সময়, স্থান, সম্ভাব্য ব্যক্তি, সভার যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে আগাম অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।..." উক্ত নির্দেশনায় রাজনৈতিক দল ও তাদের সহযোগী সংগঠনের সভা-সমাবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ নেই। উক্ত নির্দেশনায় "দেশী/বিদেশী ব্যক্তি/সংস্থা" বলতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও এনজিওসমূহকে নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের কোন দেশী/বিদেশী ব্যক্তি/সংস্থাগুলো পার্বত্য অঞ্চলে এসে সভা-সমাবেশ করতে চাইতে সেক্ষেত্রে তাদের পূর্বানুমোদন নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের কথা উল্লেখ নেই। জেলা প্রশাসক এটাকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে বিবেচনা করা হয়। জনসংহতি সমিতিসহ রাজনৈতিক দলসমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের কার্যক্রমকে দমন-পীড়নের জন্য জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটিবাসীর উপর এই নির্দেশনা চাপিয়ে দিচ্ছেন। জেলা প্রশাসকের এই অবৈধ ও মনগড়া সিদ্ধান্ত সংবিধানে স্বীকৃত বাক-স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। উল্লেখ্য যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশনার বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতিসহ দেশের নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গোড়া থেকেই প্রতিবাদ এবং প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে।

আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত আইন-শৃঙ্খলা সভা কলেজের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসক কোন যৌক্তিকতা ছাড়াই কলেজের বাইরে রাঙ্গামাটি শহরে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের উপর বিধি-নিষেধ জারি করেন।

জুম্মদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ, জনৈক দোকানদার ও পুলিশের মিথ্যা ও সাজানো মামলা

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোতায়ালী থানায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার ছাত্রলীগ সভাপতি সুলতান মাহমুদ বাপ্পা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৪০/৫০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করে ১৭ অক্টোবর (মামলা নং ০৭/১০৬, জিআর ৩৫৮/১৫)। এ মামলায় হামলা, মারধর ও গাড়ীতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনা হয়। কলেজের পিসিপি ও ছাত্রলীগের মধ্যে ঘটনাটি সংঘটিত হলেও উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এ মামলায় পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পিসিপির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে এ মামলাটি সাজানো ও বানোয়াট বলে সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং মামলাটি মূলত রাজনৈতিকভাবে হয়রানির উদ্দেশ্য দায়ের করা হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়।

মোঃ শাহ আলম (৪৫) পীং অলি উল্যাহ পাটোয়ারী নামে কলেজ গেইটের দোকানদার আরেকটি মামলা দায়ের করে ১৭ অক্টোবর (মামলা নং ০৫/১০৪, জিআর নং ৩৫৬/১৫)। এ মামলায় ২৪ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাতনামা ১৫০/২০০ জনের হামলা, দোকানপাট ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগর অভিযোগ আনা হয়। মামলায় যে ২৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা কেউই পিসিপির সাথে জড়িত তো নয়ই, ঘটনার সময় অনেকে রাঙ্গামাটি শহরে উপস্থিত ছিলেন না। যেমন

ঘটনার সময় বাঘাইছড়িতে সাংগঠনিক কাজে সফর ছিলেন নিলোৎপল খীসা, শহরের বাইরের ছিলেন মিস নীলা চাকমা, চিকিৎসায় রয়েছেন কিশোর কুমার চাকমা। মিস নীলা চাকমা বর্তমানে আর কোন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত নন। এ মামলায় আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক গুণেন্দু বিকাশ চাকমার বিরুদ্ধে দোকানপাট ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগর অভিযোগ আনা হয় যা হাস্যকর বৈ কিছু নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শাখা কমিটির তালিকা দেখে এলোপাতাড়িভাবে নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় এই মামলাটি সম্পূর্ণভাবে বানোয়াট ও সাজানো এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য তথা জুম্মদের হয়রানির উদ্দেশ্যে রুজু করা হয়েছে।

তৃতীয় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে কোতোয়ালী থানার এসআই (নিঃ) মোঃ রমিজ আহমদ কর্তৃক ১৭ অক্টোবর (মামলা নং ০৬/১০৫, জিআর নং ৩৫৭/১৫)। এ মামলায় অজ্ঞাতনামা ২০০ জন পাহাড়ি ও অজ্ঞাতনামা ২০০ বাঙালির বিরুদ্ধে হামলা, পুলিশের কাজে বাধাদান, সরকারি ও জনগণের সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের অভিযোগ আনা হয়।

পুলিশ ছাত্রলীগ ও জনৈক দোকানদারের মামলা গ্রহণ করলেও পিসিপির জনৈক সদস্যের মামলা গ্রহণে অস্বীকার করে। একপর্যায়ে ১৯ অক্টোবর কোতায়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মতি সাপেক্ষে পিসিপি সদস্যরা থানায় গেলে নানা তালবাহানা করে ২/৩ ঘন্টা বসিয়ে পরিশেষে বলা হয় যে, উপরের চাপ রয়েছে, তাই তাদের পক্ষে মামলা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। পরে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার রাঙ্গামাটি জেলার পুলিশ সুপারের কথা বলার পর মামলা গ্রহণ করা হবে বলে বলা হয়। পিসিপির সদস্যরা আবার থানায় মামলা করতে যান। এজাহার কপি জমা দেয়া পর প্রাপ্তিস্বীকার পত্র দেয়া হচ্ছে বলে পিসিপি সদস্যদের আবার বসিয়ে রাখা হয়। অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার পর একপর্যায়ে 'মামলাটি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না' বলে পুলিশ জানিয়ে দেয়।

ঘটনা সংঘটনের মূল উদ্দেশ্য

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সেদিন ছাত্রলীগের মিছিলে ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্র শামসুজ্জামান বাপ্পিসহ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। পিসিপির মিছিল শুরুতেই ছাত্রলীগ কর্মীরা যে স্থানে পিসিপি মিছিল শুরু করে সে স্থানটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে দখল করে নেয়। বহিরাগত ছাত্রদের নিয়ে আসা ও পিসিপির স্থান দখল করার ঘটনা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ ধরনের ঘটনা সংঘটনের জন্য ছাত্রলীগ কর্মীরা পূর্ব পরিকল্পিত প্রস্তুতি নিয়ে কলেজে উপস্থিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া এবং সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অসহযোগ আন্দোলন জোরালোভাবে এগিয়ে চলেছে। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে পিসিপি নেতৃত্বে জনমতের বিপরীতে বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে হয়রানির উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে ছাত্রলীগ রাঙ্গামাটি কলেজের ঘটনাটি সংঘটিত করে বলে নিঃসন্দেহে বিবেচনা করা যায়। সেই লক্ষে তারা সেদিন বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকেও নিয়ে আসে। কিন্তু প্রশাসন সেসব বহিরাগত ছাত্রদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে একেবারেই নিশ্চুপ। তাই এক্ষেত্রে সরকারের প্রভাবশালী বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। তাই এটা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের চলমান অসহযোগ আন্দোলন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা, মিথ্যা মামলা দায়ের করে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে হয়রানি করা, সর্বোপরি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে পিসিপির চলমান আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগ তথা ক্ষমতাসীন মহল পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের এ ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে।

পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

"জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে যেতে হবে, ছাত্র সমাজকে নিতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দায়িত্ব"

– জুম্ম ছাত্রদের প্রতি সন্তু লারমার আহ্বান

পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে যেতে হবে। সমাজ ব্যবস্থাকে জানার মধ্য দিয়ে আত্মকেন্দ্রীকতা থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে নিজের জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করা তথা তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টাকে প্রাধান্য দিতে হবে। ছাত্রজীবন হচ্ছে রাজনীতি করার উপযুক্ত সময়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে পার্বত্য অঞ্চলের যারা নবীন তাদের ভবিষ্যৎ হবে নিরাপত্তাহীন ও অন্ধকার– এই বাস্তবতাকে বুঝতে হবে বলে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন।

গত ৯ অক্টোবর ২০১৫ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অডিটোরিয়ামে নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ ও বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবীণ বিদায় সংবর্ধনা ২০১৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রী লারমা এ কথাগুলো বলেন। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অনিল মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে আরো বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোঃ আজগর আলী চৌধুরী, আইন অনুষদের ডীন ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনন্দ বিকাশ চাকমা, সহকারী প্রক্টর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, সহকারী প্রক্টর লিটন কুমার মিত্র, সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক বসুমিত্র চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি শরৎ জ্যোতি চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রিটিশ চাকমা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ ও দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

উক্ত নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সবাইকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান অতিথি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, আজকের দিনটা নি:সন্দেহে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের, পাহাড়ি ছাত্র সমাজের একটা স্মরনীয় দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যে যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা অনেক মূল্যবান কথা তুলে ধরেছেন। আমি সে সব কথা পুনরাবৃত্তি না করে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো।

সর্বপ্রথমে আমি শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাই, যারা এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, যারা নবীন। যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়েছেন বা নিচ্ছেন তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে আমি তার পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করতে চাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে আমাকে যে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন যে বিশেষভাবে বিশেষায়িত করে জ্ঞাপন করেছেন, আমি মনে করি যে সমস্ত গুণে-গুণান্বিত করে আমাকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানানো হয়েছে, সেভাবে আমার মনে হয় আমি ততটুকু যোগ্যতা সম্পন্ন নই। তবুও আমি এ কথাই বলবো- আজকে যারা আমাকে যেভাবে দেখছেন, শুনছেন, সেটা শুধু বাইরে থেকে দেখলেই হবে না, শুধু আমার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দেখলেই হবে না। সেটা অবশ্যই আমাদের স্ব স্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে দেখতে হবে। আজকে পার্বত্য অঞ্চলে যে বাস্তবতা সে বাস্তবতার নিরীখে হয়তো বা সেভাবে আমাকে দেখা হচ্ছে বা আমার সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

যা হোক আমি অবশ্যই তার প্রেক্ষিতে বলতে চাই- আপনাদের শুভেচ্ছা-অভিনন্দন বিপরীতে আমি আগামী দিনেও যতদিন বেঁচে থাকি; আমি চেষ্টা করবো পার্বত্য অঞ্চলের অধিকারহারা, শোষিত বঞ্চিত জুম্ম জনগণের তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে ভূমিকা রাখতে, তার পাশাপাশি বাংলাদেশের তথা সারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মেহনতি মানুষের

স্বাধীকার-অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে ভূমিকা রাখতে। আমি আশা করবো যে, সেক্ষেত্রে আপনারা যারা নবীন যারা ছাত্র সমাজ তারা এই সংগ্রামে বাস্তবতাকে আপনারা অবশ্যই চিন্তাধারা গভীরে গিয়ে মূল্যায়ন করবেন।

আজকে এখানে নবীনদেরকে বরণ করা হচ্ছে প্রবীনদের বিদায় দেয়া হচ্ছে। আসলে এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা। আজকে এখানে নবীনরা নতুন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ভর্তি হয়েছেন, অন্যদিকে যারা বিদায় নিচ্ছেন তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকটা বছর তারা কাটিয়ে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিয়ে তারা বিদায় নিচ্ছেন। এখানে যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে, এখানে আপনারা আজকের এই নবীন বরণ অনুষ্ঠানে দুটি লাইনে যে কথাগুলো ব্যক্ত করা হয়েছে যে- "শেকড়ের টানে ফিরে যাও, বিশ্বজ্ঞানে হয়ে বলীয়ান, ভেঙ্গে দাও আত্মকেন্দ্রীকতার শৃঙ্খল, শিকড়ই হোক মোদের প্রাণ"।

আজকে এই দুটি লাইনের মধ্যে কিন্তু একটি বিষয় প্রতিফলিত করেছে যে, বিষয়টা মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে। এখানে শেকড় বলাটা অনেকভাবে ব্যাখা দেয়া যেতে পারে। শেকড় আপনার গ্রাম, আপনার জন্মস্থান হতে পারে। আপনার দেশ, জন্মভূমি হতে পারে। আপনার অঞ্চল হতে পারে। শেকড় হতে পারে এখানে আপনি যে একজন মানুষ, মানুষের অবস্থানটা হতে পারে।

এখানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ যেটা ব্যাখ্যা দিতে চায় সেটা হচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন-প্রবীন যারা তারা আজকে শিকড়ের সন্ধানে পড়াশুনা করছেন এবং এই পড়াশুনার সমাপ্তির পরেই তারা সেখানেই ফিরে যাবেন। সেখানে বলতে এটা কোথায়? তার ঠিকানা কি? আজকে এই পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, এখানে শুধু মানুষ বসবাস করে না। এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী বসবাস করে, এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ জগত আছে, এখানে আলো-বাতাস, এখানে অনেক কিছু দিক নিয়েই এই পৃথিবী। আজকে এই পৃথিবীকে জানার জন্য এবং এই পৃথিবীতে যারা বসবাস করেন তাদেরকে জানার জন্য তাদের কাছে যাওয়ার জন্য এটা হওয়া উচিত। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শিকড়ে ফিরে যাওয়াটা আমি মনে করি তাই।

এই পৃথিবীকে সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে গড়ে তোলার, প্রতিষ্ঠিত করার যে আন্দোলন ও লড়াই সংগ্রাম, সে সংগ্রামে শেকড়ের টানে, পৃথিবীকে সুন্দরতম করে গড়ে তোলার যে বাস্তবতা আমার মনে হয় সেটাই হওয়া উচিত। আজকে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যাদের কথা প্রথম থেকে আমি বলছি সেই মানুষদের সমাজ ব্যবস্থা কি রকম? সেটাও জানা দরকার। সেই সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যারা জন্ম নিয়েছি, আমরা বড় হয়েছি, আমরা একটা জীবনকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি, সে সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে শ্রেণি বিভক্ত সমাজ। এখানে জাতিগত বৈষম্য আছে। এখানে আছে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত বৈষম্য, বর্ণ-লিঙ্গ-অর্থনৈতিক বৈষম্য তথা সংস্কৃতিকগত বৈষম্য আছে।

সংস্কৃতি মানেই হচ্ছে তার সামগ্রিক জীবনধারা। একজন মানুষের, একটা জনগোষ্ঠীর যে জীবনধারা সে জীবনধারার সব কিছু নিয়েই হচ্ছে সংস্কৃতি। পার্বত্য অঞ্চলে তথা সারা বাংলাদেশেরই সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা। এখানে শ্রেণি বৈষম্য থাকার কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে, সেটা সমাজে অনিবার্য। আজকে সেই হিসেবে এই সমাজ ব্যবস্থার যে বাস্তবতা, সেখানে অনেকগুলো ক্ষতিকারণ বা ভুল চিন্তাধারা রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই আত্মকেন্দ্রীকতা বা স্বার্থপরতা বা আত্মমুখীনতা। শুধু নিজের দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়ার যে মানসিকতা, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি সেটার অর্থটাই হচ্ছে আত্মকেন্দ্রীকতা। সেই আত্মকেন্দ্রীকতার যে সমস্যাটা রয়ে গেছে সেটাকে চিহ্নিত করে এটার বিরুদ্ধে গিয়ে সেটা থেকে বেরিয়ে এসে আপনার নিজের যে শেকড়ের সন্ধান করার কথাটা এখানে বলা হয়েছে এবং সেটাই হতে হবে। আমি যদি স্বার্থবাদী হই, আমি যদি আত্মমুখী হই, আমি যদি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকি তাহলে আমি কিভাবে আমার সমাজ ব্যবস্থাকে জানতে পারবো?

আমি মনে করি, এখানে শেকড়কে যে অর্থে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ বিশ্বের বুকে যে সমাজ ব্যবস্থা, সেই সমাজ ব্যবস্থাকে জানার মধ্য দিয়ে আমাকে আত্মকেন্দ্রীকতা থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে মানুষের জীবনটাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার তথা প্রতিটি মানুষকে তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যা হোক আমি এই স্বল্প পরিসরে সে ধরনের বক্তব্য আমি দিতে যাচ্ছি না। আমি শুধু এই কথাটাই জানাতে চাই যে, আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনা করছেন, যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আসবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আপনি ফিরে যাবেন। কিন্তু আপনি কি মনে করেন- আপনি শিক্ষিত হয়ে, জ্ঞানী হয়ে ফিরে যেতে পারছেন? আমি বলবো- না। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক অপূর্ণতার দিকে আছে। সেগুলো নিজের উদ্যোগে পরিপূরণ করে নিতে হয়। সেজন্য নবীনদের উদ্দেশ্যে বলবো, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা তথা সামগ্রিক উন্নয়নে আপনি অবশ্যই ভূমিকা রাখবেন, সহযোগিতায় রাখবেন। কিন্তু তার পাশাপাশি আপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও আরো শিক্ষিত হওয়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনাকে এগিয়ে থাকতে হবে। সেটা যদি আপনি না করে থাকেন তাহলে আপনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতার মধ্যে আপনার জীবনকে খুঁজে পাবেন না। অর্থাৎ আপনি আত্মকেন্দ্রীকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন।

আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে, ইতিমধ্যে আপনাদের চোখের সামনে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের বিসিএস পরিক্ষায় যান, পাশ করেন এবং চাকুরিতে যান, চাকুরিতে যাওয়ার পর আমরা দেখি- তাদের কতজন চাকুরীজীবী জীবনের সে পর্যায় থেকে বেরিয়ে এসে এই বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ নিয়ে তারা ভাবেন। আমার মনে হয় এটা বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে, আজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আপনাদের আরো অন্যান্য শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আপনি যে সমাজে বাস

করেন, জন্ম নিয়েছেন, যে সমাজে থেকে পড়াশুনা করছেন, যে পরিবেশে আপনি পড়াশুনা করছেন, সে সমাজ ব্যবস্থাকে জানতে হবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক সার্বিকভাবে আপনাকে সেটা জানার চেষ্টা করতে হবে।

আমিও একজন ছাত্র ছিলাম। আমি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আমি কিন্তু শুধু সেখানেই ছিলাম না তার বাইরেও পড়াশুনা করেছি। এখানে অনেকেই বলেন- ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা ঠিক নয়। আমি বলবো যে, ছাত্র জীবনে হচ্ছে উপযুক্ত সময় রাজনীতি করার। তার মানে আপনি যদি রাজনীতি না শেখেন তাহলে আপনি কিভাবে পরবর্তী জীবনে এই রাষ্ট্রের মানেটা কি তা কিভাবে বুঝবেন? রাষ্ট্র মানেই তো রাজনীতি। এখানে সবকিছুই রাজনীতি। আপনি আপনার মৌলিক অধিকারের জন্য যে কাজটি করেন, যে কথাটি বলেন, যে চিন্তা করেন সেটাই হচ্ছে রাজনীতি। আজকে রাজনীতির বাইরে তো কেউ না। কিন্তু আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী কতগুলো আইনের সীমাবদ্ধতায় রেখে তাদের স্বার্থ পরিপূরণ করেন বিধায় এখানে যারা সরকারি চাকুরি করেন তারা রাজনীতি করতে পারবে না এই মর্মে চাকুরিজীবীদের নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেই চাকুরিজীবীরও তো ভোটাধিকার আছে, তিনি তো ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। তাহলে তিনি যদি ভোটাধিকারের অধিকারী হন, তাহলে কোন রাজনৈতিক সংগঠনে তার থাকার অধিকার তিনি পাবেন না কেন? কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে অন্য ধরনের। যা হোক- আমি সে দিকে যাচ্ছি না।

আমি শুধু বলতে চাই- ছাত্র জীবনে আপনি শুধু সিলেবাসের মধ্যে থাকেন তাহলে আপনি যে বিশাল পৃথিবী, বিশাল যে সমাজ ব্যবস্থা, সেটা আপনি কিভাবে বুঝবেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ আছে, বিজ্ঞান, কলা বিভাগ আরো অনেক বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সময়ে তো এত বিভাগ ছিল না। আমাদের নির্দিষ্ট যে বিষয় ছিল সেটার উপরই আমরা পড়াশুনা করেছি। কলা বিভাগে আমি ছাত্র ছিলাম এবং ওই সময়ে আমি যতটুকু সীমাবদ্ধ পরিসরে জানার চেষ্টা করি। কিন্তু তার বাইরে যেতে হয়েছে, রাজনীতি দলে যুক্ত থাকতে হয়েছে, সংগঠন করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমি ছাত্র ইউনিয়ন করেছি, আমি কমিউনিস্ট পার্টি করেছি। বর্তমানে আমি যে রাজনীতিতে জড়িয়ে আছি সে দলের আর্দশ কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ একই কথা।

আজকে যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি যে, আমি আমার মানব জাতির কল্যাণে আমি আমার সমাজ জীবনে কাজ করবো। তাহলে সে কাজটা কোন চিন্তাধারা, কোন দর্শনের ভিত্তিতে হতে হবে, সেটা তো জানতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো সে চিন্তাধারা স্থিরকৃত হয় না। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া হয়, সারা বছর পাশ করে তার নিয়মমাফিক পাশ করার পর একটা ডিগ্রি দেয়া হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু আমি বাংলা ভাষায় মাষ্টার ডিগ্রি করেছি। আমি তো বাংলা ভাষা বলতেও পারি না, লিখতেও পারি না। কিন্তু এটা কেন হয়েছে, এটা হয়েছে চর্চার উপর। এটা সে দিকে না যাওয়াতে এই অবস্থা। তাহলে অন্যান্য যারা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেন, তারা যদি সেটা চর্চা না করেন, তাহলে সেটা তো হারিয়ে ফেলবেন, এটাই বাস্তবতা। আজকে সেজন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এখানে যারা ছাত্র সমাজ তাদের উদ্দেশ্যে আমার যেটা বলার, তা হলো- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে আপনাকে আরো অধিক বিষয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে হবে। যেটা আপনি আপনার সিলেবাসে পাবেন না। বিশেষ করে যারা বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করেন, যারা বিশেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিভাগে পড়াশুনা করেন, যারা হয়তো কলা বিভাগে পড়াশুনা করেন, তারা হয়তো কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান হয়তো পাওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু অন্যান্যদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। এজন্য এটা নিজস্বভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে। যারা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হন তাদের বিষয়ে সেটা আরো বেশি বলা যেতে পারে।

এজন্য ছাত্রদের অবশ্যই তার সমাজ ব্যবস্থা চেনার জন্য, জানার জন্য অধিকতর অধ্যয়ন করতে হবে। আপনি লেখাপড়া করার পর একটা পেশায় যাবেন, সে পেশা অনেক কিছু হতে পারে। চাকুরি হতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য হতে পারে, হতে পারে অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কাজ কর্মে। কিন্তু আপনি যে কাজ করুন না কেন, তার পশ্চাৎতে যে কাজ করবে- সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত দর্শনটা কি? ব্যক্তিগত চিন্তাধারা কি? সেটার উপর নির্ভর করে। এজন্য আজকে এই সমাজ ব্যবস্থাকে জানার মধ্য দিয়ে আপনার দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আপনি কোন দর্শনে থাকবেন। আপনি যদি সামন্তবাদী দর্শনে জীবনকে খুঁজে পেতে চান তাহলে সেভাবে আপনার জীবন হবে। আপনি যদি বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী দর্শনে জীবনকে খুঁজে পেতে চান তাই হবে। যদি আপনার জীবনকে জাতীয়তাবাদী দর্শনে খুঁজে পেতে চান, তাই হবে। আপনি যদি সাম্যবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে জীবনকে খুঁজে পেতে চান সেটা সেভাবেই হবে।

সামন্ত-বুর্জোয়া তথা জাতীয়তাবাদী এবং সাম্যবাদী চিন্তাধারা সম্পন্ন আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বসবাস করি। আমাদের পড়াশুনা সাম্যবাদী চিন্তাধারা ভিত্তিতে নাই। এখানে অবশ্যই জাতীয়তাবাদী, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আঙ্গিকেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আমাদের সিলেবাস, আমাদের সবকিছু। এজন্য আপনার চিন্তাধারায় অর্জিত শিক্ষা কিন্তু আপনার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। আজকে জাতিভেদের কারণে আমাদের মধ্যে জুম্ম জাতীয়তাবাদের বাস্তবতা রয়েছে। এখানে জাত্যাভিমান, বৃহৎ জাতীয়তাবাদের কারণে ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ আজকে নানাভাবে আবর্তিত হচ্ছে। আজকে সমাজের যে বাস্তবাতা, সে কারণে তার বিভেদ-বৈষম্য বিদ্যমান। সেই বিভেদ-বৈষম্য সকল ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কেন বেশি? আজকে বাংলাদেশে পাহাড়ি ছাত্রদের পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা সকল ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে যে কোটা হিসেবে। শতকরা

পাঁচ ভাগ দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বিদ্যালয়ে এটাকে সম্মান করে কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা তো করে না। এখানে শুধু ভৌগোলিক অবস্থানটা না, কাছাকাছি বলে এখানে সংখ্যাটা বেশি হবে তা না। সেটা একটা দিক অবশ্যই। কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা প্রশাসনিক, যারা নীতি-নির্ধারণী দায়িত্বে থাকেন, তারা কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তাদের যে সহানুভূতি, তাদের প্রতি যে দায়িত্ববোধ, যে মমত্ববোধ সেটা প্রসংশনীয় ও অগ্রগণ্য। সেটা যদি না হতো তাহলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পেতো না। আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ওখানে পড়াশুনা করতে যায়, যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে। অনেকের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মতো মেধা-যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি তারা সে সুযোগ ভোগ পারে না। আজকে এখানে যারা প্রগতিশীল নয়, গণতান্ত্রিক নয়, তারা স্বাভাবিকভাবে বিষয়টা অন্যভাবে নিতে পারে। আজকে গোটা দেশের বাস্তবতায় সেটাই প্রতিফলিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তথা বাংলাদেশের আদিবাসী বিভিন্ন জাতির তার সমাজ জীবনের যে বাস্তবতা সেটাই হচ্ছে প্রতিফলন।

বাংলাদেশে যারা খেতে-খাওয়া মানুষ, যারা শ্রমজীবী মানুষ, যারা গরীব কৃষক, যারা স্বল্প আয়ের পেশাজীবী, তাদের জীবনের যে বাস্তবতা সেটা প্রতিফলিত ঘটতে আমরা দেখি। বাংলাদেশের যে বাস্তবতা তাতে প্রচন্ডভাবে শ্রেণি বৈষম্য বিরাজমান। সে কারণে এখানে শ্রেণিগত শোষণ-নিপীড়ন, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা সবকিছুই বিরাজমান। এই কারণে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সে চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারছে না বা এদেশের শাসকগোষ্ঠী সেটা বাস্তবায়নে দ্বিধাগ্রস্ত। কেন দ্বিধাগ্রস্ত? সেটা বুঝতে গেলে অবশ্যই সেই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দর্শনকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। এখানে অনেক কিছু বলা হতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর তাদের শ্রেণিগতভাবে সেই শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত। যারা এদেশের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী-আদিবাসী জাতিসমূহের, বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ, গরীব মানুষের উপর শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে যারা অসহায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। যেমন- বাংলাদেশের কমপক্ষে ৪৫ টির অধিক আদিবাসী জাতি আজকে বিলুপ্তির দিকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪টি জাতি আজকে তারা বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে। পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের যে স্বাধীকার-অধিকার সেটা ব্রিটিশ আমলে যতটুকু ছিল সেটাও আজকে হারিয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের আমরা নাগরিক। আজকে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিল সেভাবে দেশ চলছে না, চলতে পারছে না। আজকে বাংলাদেশের সংবিধানে এদেশের গরীব মানুষের, মেহনতী জনগণের, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে না। আদিবাসী জাতিসমূহের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে না। আজকে এই বাস্তবতা আমরা দেখি।

আজকে আমাদের পরিচিতি কি? একদিকে বলা হচ্ছে- বাংলাদেশের জনগণ তারা সবাই বাঙালি। অন্যদিকে বলা হচ্ছে- আমরা উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, বলা হচ্ছে- সম্প্রদায়। তাহলে যাদেরকে এভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে তারাও তো মানুষ। আজকে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে বাঙালি না বলে তাদেরকে যদি বলা হয়- বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী তাদের কেমন লাগবে? অথচ আমাদেরকে বলা হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। আমার পরিচয়টা তো হারিয়ে গেছে। এই যে বাস্তবতা

বাংলাদেশে যারা খেতে-খাওয়া মানুষ, যারা শ্রমজীবী মানুষ, যারা গরীব কৃষক, যারা স্বল্প আয়ের পেশাজীবী, তাদের জীবনের যে বাস্তবতা সেটা প্রতিফলিত ঘটতে আমরা দেখি। বাংলাদেশের যে বাস্তবতা তাতে প্রচন্ডভাবে শ্রেণি বৈষম্য বিরাজমান। সে কারণে এখানে শ্রেণিগত শোষণ-নিপীড়ন, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা সবকিছুই বিরাজমান। এই কারণে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সে চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারছে না বা এদেশের শাসকগোষ্ঠী সেটা বাস্তবায়নে দ্বিধাগ্রস্ত। কেন দ্বিধাগ্রস্ত? সেটা বুঝতে গেলে অবশ্যই সেই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দর্শনকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। এখানে অনেক কিছু বলা হতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর তাদের শ্রেণিগতভাবে সেই শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত। যারা এদেশের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী-আদিবাসী জাতিসমূহের, বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ, গরীব মানুষের উপর শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে যারা অসহায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। যেমন- বাংলাদেশের কমপক্ষে ৪৫ টির অধিক আদিবাসী জাতি আজকে বিলুপ্তির দিকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪টি জাতি আজকে তারা বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে।

এটা তো অনুভব করতে হবে। আজকে এই বাস্তবতা আমাদের দেশে বিরাজমান। আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নয়, গণমুখী নয়। আমাদের দেশের আইনগুলো পক্ষপাত দুষ্ট। এখানে সংখ্যায় কম সেই শাসকশ্রেণির জন্য, স্বার্থের জন্য এখানে আইন প্রণীত হয় এবং সেগুলো বাস্তবায়িত হয়।

আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে এবং তদনুসারে আইন প্রণীত হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে, কিন্তু এই আইনগুলো কার্যকর করা হচ্ছে না। এখনও জেলা প্রশাসকরা বৃটিশের দেওয়া উপনিবেশিক আইন সেই ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে

পার্বত্য অঞ্চল শাসন করছেন। এখনও বাংলাদেশের ঘোষিত সেই অপারেশন দাবানল যা এখন পরিবর্তিত হয়ে অপারেশন উত্তরণের নামে প্রচলিত রয়েছে তার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা কর্তৃত্ব চলছে। সেখানে প্রতিরক্ষার নামে চলছে দমন-পীড়ন-নিপীড়ন। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বিধিমালা, ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন না করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ৩৪ সদস্য পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন না করে, অন্তর্বর্তী পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ৫ জন থেকে ১৫ জনে বৃদ্ধি করে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে দুর্নীতির পরিধি আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। আজকে এই যে বাস্তবতা কি বলে?

এখানে আপনারা সবাই নবীন। আমিও এক সময় আপনাদের মতো বয়সে তরুণ ছিলাম। যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে, উচ্চারিত হয়েছে- পাকিস্তান শাসনামলে, আইয়ুব খানের শাসনামলে সেই কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হলো। কর্ণফুলির বুকে বাঁধ দেয়া হলো। এখানে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্যুৎতায়ন হবে, বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, মানুষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষেরা, পাহাড়িরা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পাবে, জীবন সুন্দর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলে কাপ্তাই বাঁধ দেয়া হলো। কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়ি মানুষের, জুম্ম জনগণের মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই কাপ্তাই বাঁধকে ঘিরে তখনকার সেই ৬০ দশকের ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসেছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের মহান নেতা যিনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি এই কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন করেছিলেন। তার সাথে যুক্ত থেকে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসেছিল এবং একটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তারা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের স্বাধীকার-অধিকারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার পাশাপাশি পাকিস্তান আমলেও জুম্ম জনগণের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা, শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করা, সচেতন করার কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। আজকে আপনারা নবীন, আমরা প্রবীন হয়ে গেছি। শুধু প্রবীন না, আমরা বৃদ্ধ অবস্থায় চলে গেছি। সে বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। কেন করেছি? পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি যারা স্থায়ী মানুষ আছেন, তাদের মৌলিক অধিকার, নুন্যতম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাহলে আমরা যারা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সশস্ত্র-নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা যারা এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, এই চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের একটা বিশেষ শাসনব্যবস্থা আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এ অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী মানুষের অধিকার আদায় করে নিয়েছি, সেটা যথাযথ বাস্তবায়নের দায়িত্বটা কার? এই বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিন্তু আপনাদেরই। এই অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে পার্বত্য অঞ্চলের যারা নবীন সমাজ তাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকার। এই বাস্তবতাকে বুঝতে হবে।

আজকে আপনারা নবীন, আমরা প্রবীন হয়ে গেছি। শুধু প্রবীন না, আমরা বৃদ্ধ অবস্থায় চলে গেছি। সে বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। কেন করেছি? পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি যারা স্থায়ী মানুষ আছেন, তাদের মৌলিক অধিকার, নুন্যতম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাহলে আমরা যারা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সশস্ত্র-নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা যারা এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, এই চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের একটা বিশেষ শাসনব্যবস্থা আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এ অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী মানুষের অধিকার আদায় করে নিয়েছি, সেটা যথাযথ বাস্তবায়নের দায়িত্বটা কার? এই বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিন্তু আপনাদেরই। এই অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে পার্বত্য অঞ্চলের যারা নবীন সমাজ তাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকার। এই বাস্তবতাকে বুঝতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হচ্ছে এটা রাজনৈতিক এবং জাতীয় সমস্যা। এই জাতীয় এবং রাজনৈতিক সমস্যাটা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হয়েছে কিন্তু সেটা পুর্ণাঙ্গ যে রূপ সেটা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমি যে কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই- আজকে ২০১৫ এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ যারা পার্বত্যাঞ্চলের ভবিষ্যত নেতৃত্বের দাবি রাখে, সেই ছাত্র সমাজকে এই বাস্তবতা বুঝতে হবে। এখানে শুধু আমি পড়াশুনা করলাম, গ্রাজুয়েশন করে বেরিয়ে গেলাম, আমি মনে করি এখানেই শেষ নয়। পার্বত্যাঞ্চলের অশান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে আপনি এখানে পড়াশুনা করতে এসেছেন। এই বাস্তবতাকে আপনার চিন্তাধারার আলোকে, দর্শনের আলোকে বুঝতে হবে।

আমার অবশ্যই আজকে এখানে আসতে পেরে ভালো লাগছে। কিছু কথা বলারও যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য অবশ্যই আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো, সেটা হচ্ছে যে- আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আদায় করে নিয়েছি। আপনারা যদি বলেন- যেহেতু সন্তু লারমারা এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সুতরাং তাদেরকেই এই চুক্তি বাস্তবায়ন করে যেতে হবে। মানুষ চিরদিন বাঁচে না। বস্তু পরিবর্তনশীল। মানুষও একটা বস্তু। মানুষেরও পরিবর্তন হয়। তার পরিবর্তিত বয়সের তালে তালে এবং গোটা সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে মানুষ তার ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে সে যায়। আজকে যারা ৬০ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জন্য, তাদের

স্বাধীকার-অধিকারের জন্য যারা লড়াই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তারা বয়সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরে ১৭-১৮ বছর অতিবাহিত হলেও সেই চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তাহলে আজকে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম যুব সমাজের মধ্যে যারা অগ্রগামী তারা হচ্ছেন ছাত্র সমাজ। এই জুম্ম ছাত্র সমাজকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমি এটা স্পষ্টভাবে বলতে চাই- আমরা যারা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ কেবল এক-দুই দশক নয়, চার দশক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চুক্তির একটা পর্যায়ে নিয়ে এসে গেছি; সেই বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। আজকে যারা এখান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বিদায় নিচ্ছেন অথবা যারা আজকে ভর্তি হয়েছেন উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য, আপনাদের কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব আছে। আপনারা আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তিয়ে দিয়ে আপনাদের কর্তব্য হতে পারে না। আপনাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে আপনার ভবিষ্যত কি হবে সেটা সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। একজন মানুষ তার মৌলিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়, বেঁচে থাকতে চায়। সেই মৌলিক অধিকার যদি স্বাধীনভাবে সে যদি না পেয়ে থাকে তাহলে তার জীবনটা জীবন হতে পারে না। আর সেটা হয় বিলুপ্তির দিকে যাবে অথবা সে নতুন একটা কিছুর দিকে ধাবিত হবে। আজকে বাস্তবতা হচ্ছে- আমরা যদি আমাদের এই অধিকারগুলো যদি কার্যকর করতে না পারি তাহলে আমাদের জীবনের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। ভবিষ্যত হবে নিরাপত্তাহীন। আমার আজকে বিশেষ করে ভালো লেগেছে, এখানে যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের বক্তব্যগুলো অত্যন্ত গঠনমূলক, আবেদনমূলক। অন্তরের গভীরতা, আত্মিক দিকটা তারা বক্তব্য রেখেছেন। এখানে আমরা সবাই মানুষ। এখানে জাতিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষই ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। যারা শাসকগোষ্ঠী তারাই সৃষ্টি করেছে। আজকে ধনী-গরীব সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষেরাই সৃষ্টি করেছে। আজকে সেই মানুষ যদি এগিয়ে না থাকে তাহলে ভেদাভেদ দূরিভূত হবে না। কিন্তু এই ভেদাভেদ দূরিভুত করতেই হবে। কারণ মানুষ মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাদের সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে, জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

‘বাংলাদেশের ৮৫% লোক কৃষক। আজকে যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে ফসল ফলাচ্ছে, তাদের ভাগ্য আগে যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থায় রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। কৃষকরা ভাঙ্গা ঘরে বাস করে। বর্ষা এসে গেলে বৃষ্টির পানিতে তাদের বিছানাপত্র ভিজে যায়। যে শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে কলের চাকা ঘোরাচ্ছে, তাদের অবস্থার কি করা হয়েছে? এই কৃষক আর শ্রমিক আমাদের দেশের মূল শ্রমশক্তি। খাদ্য উৎপাদন এবং কল-কারখানা থেকে আমাদের যেসব জিনিসপত্রের প্রয়োজন রয়েছে, সেই প্রয়োজন পূরণ করার ভার কৃষক আর শ্রমিকের উপর। কৃষক এবং শ্রমিকদের মুক্তি আনতে হবে।’

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

নানিয়ারচরে সেটেলার যুবক কর্তৃক কলেজ পড়ুয়া এক জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সকাল আনুমানিক ৮:৩০ টায় রাঙ্গামাটির নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের নানাক্রুম এলাকায় মোঃ মহারাজ (২০) নামের এক সেটেলার যুবক কর্তৃক কলেজ পড়ুয়া এক চাকমা ছাত্রী (১৯) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে। এর পরপরই সেটেলার যুবকটিকে আটকের পর পুলিশে সোপর্দ করা হয় এবং পুলিশ যুবকটিকে কারাগারে প্রেরণ করে।

জানা গেছে, ঐ সময়ে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অনার্স পড়ুয়া ঐ মেয়েটি তার এক বান্ধবীকে রাঙ্গামাটিগামী গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে নানাক্রুম গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। পথে একা পেয়ে মোঃ মহারাজ (২০) পীং-আলী হোসেন মুন্সী, গ্রাম- ইসলামপুর, বুড়িঘাট ইউনিয়ন উক্ত মেয়েটিকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এতে মেয়েটি নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে এবং চিৎকার করতে থাকে। মেয়েটির চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে ধর্ষণের চেষ্টাকারী যুবক পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এক পর্যায়ে জনতার হাতে সে ধরা পরে। এরপর ফোন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্থানীয় পুলিশকে ঘটনাটি জানালে তারা ঘটনাস্থলে আসে। এতে জনতা ধর্ষণের চেষ্টাকারী যুবককে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচার করে মোঃ মহারাজকে ৩ মাসের কারা দণ্ডাদেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

লক্ষ্মীছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণির এক চাকমা শিশুর শ্লীলতাহানি

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ দুপুর ১:৩০টায় খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার মরাচেঙে মুখ এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১১ বছরের এক চাকমা শিশুর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার শিকার ঔ মেয়েটি লক্ষ্মীছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী।

জানা যায়, ঘটনার সময় নির্মাণ শ্রমিক সেটেলার মো: আবদুল (২৭) গবমারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ সামগ্রী (লোহার রদ) নিয়ে সিএনজিযোগে যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় যাচ্ছিল। মরাচেঙে মুখ এলাকায় পৌছলে সেখানে স্কুল ছুটির পর পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া উক্ত ছাত্রীকে একা হেঁটে যেতে দেখে সেটেলার মো: আবদুল বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে সিএনজিতে তুলে নেয়। কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তায় লোকজন না থাকার সুযোগে ওই সেটেলার শিশুটিকে ঝাঁপটে ধরে বুকে হাত দিয়ে শ্লীলতাহানি ঘটায়। যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় পৌছার পর ওই ছাত্রী ঘটনা সম্পর্কে এলাকার লোকজনকে জানালে এলাকাবাসী মো: আবদুলকে আটকের পর মারধর করে। জানা গেছে, সেটেলার মো: আবদুল (২৭) মানিকছড়ি উপজেলার লেকুয়া পাড়ার মো: আজগর আলীর ছেলে।

এ ঘটনার পর বিকাল সাড়ে তিন ঘটিকার সময় যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ার একটি দোকানে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অগ্যপ্রু মারমাসহ এলাকার পাহাড়ি ও বাঙালি মুরুব্বীদের নিয়ে এক সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সালিশি বৈঠকে মো: আবদুলকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও শিশুটির ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরও ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৮ম শ্রেণির এক ত্রিপুরা ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ বিকাল ৫টায় খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা সদর উপজেলার ১০ নম্বর এলাকার ইছাছড়া গ্রামের সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৮ম শ্রেণির এক ত্রিপুরা ছাত্রীকে (১৪) ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার সময় ওই ছাত্রী মাটিরাঙ্গা মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয়ে জেএসসি টেষ্ট পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে ওঁৎপেতে থাকা সেটেলার মো: জাহাঙ্গীর হোসেন (২৭) ঝাঁপটে ধরে ওড়না দিয়ে মুখ বেঁধে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময়ে ওই ছাত্রীকে গলাটিপে হত্যার চেষ্টাও করেছিল বলে জানা গেছে।

ছাত্রীর চিৎকার শুনে গ্রামবাসী এগিয়ে গেলে সেটেলার জাহাঙ্গীর হোসেন পালিয়ে যায়। গ্রামবাসী ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে মাটিরাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কর্তব্যরত ডাক্তাররা খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিরণজয় ত্রিপুরার পুকুর পাড়ে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। সেটেলার মো: জাহাঙ্গীর হোসেন (২৭) ইছাছড়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

এ ঘটনায় তার মা কৃষ্ণবালা ত্রিপুরা (৩৫) বাদী হয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯ উপধারার ৪ (খ) ধারায় মামলা করেছে। ঘটনার দিন রাত নয়টায় গ্রামবাসীর মো: জাহাঙ্গীর হোসেনকে (২৭) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

সেটেলার যুবক কর্তৃক এক মারমা ছাত্রীকে ফুসলিয়ে পাচার করার চেষ্টা

গত ১৭ অক্টোবর ২০১৫ রাঙ্গামাটির শহরের ভেদভেদী এলাকা থেকে একজন সেটেলার যুবক কর্তৃক ভেদভেদীস্থ সরকারি শিশু সদনের ১০ম শ্রেণির এক মারমা ছাত্রীকে প্রেমের ফাঁদ পেতে পাচার করার চেষ্টা চালানো হয়। জানা যায় যে, সেদিন সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটিস্থ ভেদভেদী পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঐ ছাত্রী (বয়স ১৮ বছর) স্কুলে আসার পথে ভেদভেদীতে নিখোঁজ হয়। সেদিন তার এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু যথাসময়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছে নাই। জানা যায় ভেদভেদী মুসলীম পাড়ার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে মো: লিটন মোটর সাইকেল যোগে মেয়েটিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পরে থানা থেকে অভিভাবকরা নিয়ে আসে।

লামায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ভূমি দখলের চেষ্টা হামলায় অন্ত:সত্ত্বা এক মারমা নারী মারাত্মক আহত

গত ২১ অক্টোবর ২০১৫ সকাল ৯:০০ ঘটিকার সময় বান্দরবানের লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের টিয়াঝিড়ি পাড়ার মৃত: মৌলভী উজিউল্লাহ'র ছেলে মো: সাইফুল ইসলাম (৪২) ও মৃত: সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো: সেলিম সওদাগর (৫৩), মো: বাবুল মিয়া (৩৮), মো: বাদল (৩৫) এর নেতৃত্বে ২০/২৫ জন ভূমিদস্যু সেটেলার বাঙালিরা রূপসী পাড়া ইউনিয়নের পুরাতন মারমা পাড়ার রেদা মারমার ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। এসময়ে রেদাক মারমার অন্ত:সত্ত্বা মেয়ে মাম্যাসিং মারমা (২৮) ভূমি দখলে বাঁধা দিতে গেলে সেটেলার বাঙালিরা তারা উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ওই নারী গুরুতর আহত হন। পরে গ্রামবাসী তাকে উদ্ধার করে লামা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেদা মারমা (৬২) পিতা: মংফ মারমা বাদী হয়ে বেআইনীভাবে জমিতে অনধিকার প্রবেশ, মারধর করে জখম, গাছ কেটে ক্ষতি সাধন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৪২৭/৫০৬ ধারায় লামা থানায় মামলা দায়ের করেছে। মামলার বিবরণে জানা যায়, রেদা মারমার নিজ নামীয় জমি বিবাদী সেটেলার বাঙালিরা দীর্ঘদিন দখলের চেষ্টা করছিল। ঘটনার সময়ে সেটেলার বাঙালিরা ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে এসে রেদা মারমার রোপন করা ৪০/৪২টি সেগুনগাছ ও ৬০/৬৫টি কলা গাছ কেটে ফেলে। এতে প্রায় ৭০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়। সেটেলার বাঙালিদের হামলার সময় রেদা মারমার মেয়ে মাম্যাসিং মারমা নিষেধ করতে গেলে তার উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে মারাত্মক আহত করে। আহত মাম্যাসিং মারমার চিৎকার শুনে তার মা ক্রাথুইপ্রু মারমা (৫২) এগিয়ে গেলে সেটেলার বাঙালিরা তাকেও মারধর করে আহত করে।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

মানিকছড়িতে এক সেটেলার বাঙালি খুনের জেরে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলাধীন হরবিলের লাপাইন্দং পাড়ায় এক সেটেলার বাঙালি খুনের জেরে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। জানা যায় যে, ঐদিন ভোর রাত আনুমানিক ৩.৩০ টার সময় মানিকছড়ি উপজেলার হরবিলের লাপাইন্দং পাড়ায় বসবাসকারী সেটেলার বাঙালি মো: আব্দুল মতিন (৪০)সহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজন সন্ত্রাসী কর্তৃক ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হন। উক্ত ঘটনা জানাজানি হলে সকালে মানিকছড়ি গুচ্ছগ্রাম থেকে ৪০/৫০ জন সেটেলার বাঙালি এবং মানিকছড়ি আর্মী সাবজোন থেকে একগ্রুপ আর্মী ঘটনাস্থলে যায়। তৎসময়ে কয়েকজন গ্রামবাসীর মুখোমুখি হলে সেটেলার বাঙালিরা দুইজন জুম্ম গ্রামবাসীকে ধরে ফেলে এবং তাদেরকে ব্যাপকভাবে মারপিট করে গুরুতর আহতাবস্থায় সেদিন মানিকছড়ি থানায় সোপর্দ করে। জানা যায় সেটেলার বাঙালিরা ঐ গ্রামের অংশিলা মারমার দোকান ভাংচুর করে। উক্ত দিনে ঐ এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আটক দুই ব্যক্তি হচ্ছেন- মানিকছড়ির লাপাইন্দং পাড়ার বাসিন্দা রুইপ্রুচাই মারমা (৫০) পিতা- মৃত মমংশি মারমা, গ্রাম-, মানিকছড়ি এবং উষামং মারমা (৪০) পিতা- চোরা মারমা। তাদের দুইজনসহ মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে মানিকছড়ি থানায় মামলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বিকাল আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকার সময় মানিকছড়ি গুচ্ছগ্রামের নরু ইসলামের ছেলে মো: আকবর (২৫) এবং মো: মোজাম্মেল (২৫) এর নেতৃত্বে ৪০/৫০ জনের একদল সেটেলার বাঙালি প্রথমে হরবিল ও সিক্কেবিলে জুম্মদের ঘরবাড়িতে হামলা চালায়। সিক্কেবিল গ্রামের ম্রাসা মারমার বাড়িতে হামলা চালায়। ম্রাসা মারমা পরিবারের ৪ জনকে মারপিট করাসহ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। পরে তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় মানিকছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি।

সেটেলারদের উক্ত হামলায় আহত ব্যক্তিদের নাম নিম্নে দেয়া গেল- মানিকছড়ি উপজেলার সিক্কেবিল গ্রামের ১) ম্রাসা মারমা, প্রাক্তন কার্বারী (৭০) পিতা-মৃত রিসাই মারমা; ২) রাংচাই মারমা (৪২) পিতা- ম্রাসা মারমা; ৩) ক্যসাই মারমা (১৬) পিতা- রাংচাই মারমা; ৪) রেদা মারমা (১২) পিতা- রাংচাই মারমা।

নান্যাচরের বুড়িঘাট ইউনিয়নে আর্মীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের জায়গাজমি বেদখল

রাঙ্গামাটি জেলাধীন নান্যাচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নস্থ বুড়িঘাট আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডার মেজর তৌহিদ (৫৬ বেঙ্গল) এর সহায়তায় ঐ এলাকায় বসবাসরত সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ইউনিয়নের পলিপাড়া নিবাসী পাহাড়িদের জায়গাজমি বেদখল করা হচ্ছে।

গত ৪ অক্টোবর ২০১৫ উক্ত ইউনিয়নের নানাক্রুম মৌজার উপর পলিপাড়া নিবাসী ম্রাইহ্লা অং মগ (৫০) পিতা- থোয়াইলা অং মগ তার নিজ রেকর্ডীয় ৪.০০ (চার) একর, (হোল্ডিং নং-আর-১৬) জায়গায় চারা রোপনের জন্য জঙ্গল পরিস্কার করতে যায়। উক্ত সময়ে ৫ নং টিলায় বসতিকারী সেটেলার বাঙালি মো: বশির (৪৫) পিতা- মৃত মমিন উদ্দিন তাকে জঙ্গল পরিস্কার করতে বাঁধা দেয়। এতে তাদের মধ্যে বির্তক হয়। শেষে বুড়িঘাট আর্মী ক্যাম্পের উক্ত মেজরের নির্দেশে একদল সেনা সেখানে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসে জায়গাটির বিরোধ নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জমিতে কোন প্রকার চাষ করা যাবে না এবং তারা কানুনগো ডেকে মেপে দেবে। মাপার পর বর্ধিত জমি মো: বশিরকে দিতে হবে। ফলে এখন নিজ জমি হলেও মালিক চাষ করতে পারছেন না।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৫ একই গ্রামের খিলু অং মারমা (৫২) পিতা- রুইচাই মারমা এর একই মৌজায় রেকর্ডীয় আর-২১ হোল্ডিংয়ের ১৫ (পনের) একর জমি, ২ নং টিলা বসতিকারী ১) শুক্কুর আলী (৪৩) পিতা-কামরুল জামান, ২) মো: আশরাফুল মাষ্টার (৪২) পিতা-ময়নুর পিসি (মুক্তিযোদ্ধা), ৩) আমজাদ (৪৫), ৪) মো: নরু (৪৫) পিতা-কামরুল জামান, ৫) মো: এনামুল হক (৩৫) পিতা-মফিজ উদ্দিন বুড়িঘাট আর্মী ক্যাম্প কম্যান্ডার মেজর তৌহিদের সহায়তায় জোরপূর্বক দখল করে নেয়। দখল করার পর সেনারা জমির মালিককে উক্ত জমি নিয়ে মালিক কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করে থাকলে, তাহলে তাকে গুলি করা হবে বলে হুমকি দেয়।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৫ একই ইউনিয়নের উপর পুলিপাড়া নিবাসী মংলাঅং মারমা (৬৫) পিতা-মৃত সুইথোয়াই মারমা হোল্ডিং নং- আর-১৫-এর ৪.০০ (চার) একর তার নিজ জমিতে আনারস বাগান করার জন্য জঙ্গল কাটা, আগুন লাগিয়ে দেয়াসহ আগাছা পরিস্কার করার পর ঐ এলাকায় বসবাসকারী ৮ নং টিলার ১) আবুল হোসেন (৬০) এবং ২) মো: হাবিবুর (৫০) পিতা-জসিম উদ্দিন কাজে বাঁধা প্রদান করে। তবুও তিনি কাজ করা অব্যাহত রাখলে কিছুক্ষণ পর বুড়িঘাট আর্মী ক্যাম্প থেকে একগ্রুপ আর্মী এসে আর্মীরাও তাকে বলে দেয় যে, কাজ বন্ধ

রাখতে হবে। আমিন-কানুনগো এনে মেপে দেওয়ার পর চার একরের অতিরিক্ত জমি উপরোক্ত দুইজন বাঙালিকে দিতে হবে।

মহালছড়ির মাইসছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলা, আহত দুই

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৫ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়িতে এক জুম্ম গ্রামবাসী নিজ মালিকাধীন বাগানে গাছ কাটতে গেলে একজন সেটেলার বাঙালি বাধা দেয় এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে উভয়ে মারামারিতে জড়িতে পড়ে। এতে দুজনই মারাত্মক আহত হয়।

জানা য়ায়, মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ জয়সেন পাড়ার পাগুজ্যাছড়ি নিবাসী স্নেহ কুমার চাকমা (৫২) পিতাঃ পূর্ণনাথ চাকমার গৃহকর্মী অমৃত চাকমা (২৬) পিতাঃ গোপাল কৃষ্ণ চাকমাকে বাগানে গাছ কাটতে গেলে এসময়ে প্রতিবেশী সেটেলার বাঙালি জাহিদুল (৪৫) পিতাঃ মোফিজুল তার দুইজন সঙ্গী নিয়ে কোন কথাবার্তা ছাড়াই গাছ কর্তনকারী অমৃত চাকমার হামলা করে। পরে বাগানের মালিক স্নেহ কুমার চাকমা ঘটনাস্থলে এলে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডার শুরু হয়। এক পর্যায়ে মহালছড়ি থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে দুই পক্ষকে শান্ত করে। পুলিশ জানিয়ে যায়- এ বিষয়ে প্রশাসনিকভাবে মীমাংসা করে দেয়া হবে। মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত গাছ কাটা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় পুলিশ।

এরপর দু'পক্ষের মধ্যে আবারও বাকবিতণ্ডার শুরু হয়। এ সময়ে সেটেলার এনামুল (১৮) পিতাঃ সালাম বসন্ত চাকমা (৩৫) পিতাঃ নোয়ারাম চাকমাকে লাঠি দিয়ে মারধর করলে উভয়ে মধ্যে মারামারি হয়। এতে দুজনই মারাত্মক আহত হয়। আহতদের খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে মহালছড়ি আর্মী জোন হেড কোয়ার্টার ও বিজিতলা আর্মী ক্যাম্প থেকে দুইগ্রুপ আর্মী ঘটনাস্থলে পৌছে। এ ঘটনায় সেটেলার জাহিদুল ১৬/১৭ জন জুম্ম গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মহালছড়ি থানায় মামলা করেছে বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, স্নেহ কুমার চাকমা ও অনুপ্রবেশকারী সেটেলার জাহিদুল এর মধ্যে অনেক আগে থেকেই ভূমির সীমানা নিয়ে বিরোধ ছিল। সে কারণে আগেই এলাকার পাহাড়ি-বাঙালি মুরুব্বীরা মিলে ভূমির সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এ ঘটনার দিন স্নেহ কুমার চাকমা তার নিজ বাগানের নির্ধারিত সীমানার ভিতরেই গাছ কাটার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম'র ভূমি বেদখলের চেষ্টা

রাঙামাটির লংগদু উপজেলায় গত ১৭ অক্টোবর ২০১৫ একজন জুম্ম গ্রামবাসীর ৫ একর জায়গা দখলের পর সেটেলার বাঙালিরা একটি কুড়ে ঘর তৈরি করে। তথ্য সূত্রে জানা যায়, লংগদু উপজেলার ভাইবোনছড়া গ্রামের মৃত তারানি সেন চাকমার ছেলে সমীর কুমার চাকমার (৬০) ৫.০ একর জায়গা সেটেলার মো. আবদুল গফুর ও তার ছেলে রাশেদ মিয়ান বেদখলের চেষ্টা করে আসছে। যদিও উক্ত জায়গাটি সমীর কুমার চাকমার নামে রেজিস্ট্রিভূক্ত হয় তারপরও গফুর জায়গাটি নিজের বলে দাবি করে। জায়গাটি জোরপূর্বক দখল করার জন্য একটি কুড়ে ঘর তৈরির পূর্বে গফুর এবং রাশেদ জঙ্গল ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে। কিন্তু যখন জায়গার মালিক এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করে তখন গফুর আর রাশেদ স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে যায় এবং জুম্মরা তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করে। তারপর সেনাবাহিনী উক্ত জায়গাটি পরিদর্শন করে এবং সেটেলারদের অভিযোগের কোন সত্যতা খুঁজে পাননি। ক্যাম্পের কমান্ডার মঙ্গলবার উভয় পক্ষকে দাবীর স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হতে নির্দেশ দেয় বলে জানা যায়।

রামগড়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সাবেক এক হেডম্যানের ভূমি দখল

গত ২৮ অক্টোবর ২০১৫ সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার ২ নং পাতাছড়া ইউনিয়নের ২৩৩ নং তৈমরম মৌজার থলিপাড়া গ্রামের সাবেক হেডম্যান আথুঅং চৌধুরীর এক একর বসতটিলা ভূমি বহিরাগত সেটেলার একই গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৪৫) দখল করে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ঘটনার সময় আথুঅং চৌধুরীসহ পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসী বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেয়াং এ গিয়েছিল। এ সুযোগে ভূমিদস্যু সেটেলার মোঃ দেলোয়ার হোসেন ৬/৭ জন শ্রমিক নিয়ে এসে আথুঅং চৌধুরীর ৯নং খতিয়ানের বসতটিলায় ৩০০/৪০০ কলাগাছ রোপন করে দখলে নেয়। পরে আথুঅং চৌধুরী সেটেলারদের ভূমি দখলে বাধা দিলে ভূমিদস্যু সেটেলার বাঙালিরা তাকে হত্যার হুমকি প্রদান করে। একই দিনে পাতাছড়ার রেজুমনি কার্বারী পাড়ার নাগর চান চাকমার ছেলে চন্দ্র কান্তি চাকমার (৪৫) পাঁচশতক ভূমিও মোঃ দেলোয়ার হোসেন দখল করে। ভূমি দখলের ঘটনার বিষয়ে জুম্ম গ্রামবাসী সেনাবাহিনীর সিন্দুকছড়ি জোনে অভিযোগ দিয়েও কোন বিচার পায়নি। এ ঘটনা নিয়ে জুম্মদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

আলীকদমে সেনাবাহিনীর তল্লাসী এবং নিরীহ জনগণকে অমানবিক নির্যাতন

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রাত প্রায় ১০:০০ টায় বান্দরবান জেলাধীন আলীকদম উপজেলায় আলীকদম সেনা জোনের অধীন ইয়ংসা সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য ইয়ংসা ইউনিয়নের ইয়ংসা বড় পাড়ায় সন্ত্রাসী খোঁজার নামে ফোথোয়াই মারমা (৩৯) পীং-মৃত থোয়াই চিং মারমা নামের এক নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশী চালায়। সেনা সদস্যরা তল্লাশী চালিয়ে কোন কিছু না পেলেও গৃহকর্তা ফোথোয়াই মারমাকে বেদম মারধর করলে সে অজ্ঞান হয়। সেনা সদস্যরা স্থানটি ছাড়ার আগে গ্রামের প্রায় ১০/১২ জন গ্রামবাসীর কাছ থেকে জোরপূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়। পরে নির্যাতনের শিকার ফোথোয়াই মারমার জ্ঞান ফিরে আসলেও শারীরিক ও মানসিকভাবে মারাত্মক জখম হয়েছেন বলে জানা যায়। জানা যায়, গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সকালের দিকে চিকিৎসার জন্য ফোথোয়াই মারমাকে লামা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

বরকলে সেনাবাহিনীর তল্লাসী এবং নিরীহ জনগণকে অমানবিক নির্যাতন ও আটক

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ রাতে দুর্নিবার ১১ বেঙ্গলের মেজর তানভিরের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি ও বনযোগীছড়া সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের অন্তর্গত জুরাছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী এরাইছড়ি গ্রামের রাস্তামাথা নামক এলাকার গ্রামবাসীদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে এবং ভোরে কালেক্টর খোঁজার নামে বাড়ি তল্লাশী করে নারীসহ ৫ নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে নিয়ে যায়। আটককৃত ৫ নিরীহ গ্রামবাসী হল–

(১) রঞ্জিত চাকমা (৪৫) পীং-দেড়চোগা চাকমা, সাং-এরেইছড়ি;

(২) আল্পনা চাকমা (৩৭) স্বামী-রঞ্জিত চাকমা, সাং-ঐ;

(৩) রোজিনা চাকমা রশ্মী (৩৫) স্বামী-সাধন মনি চাকমা, সাং-ঐ;

(৪) লক্ষী কুমার চাকমা (৪৫) পীং-পূণ্য মোহন চাকমা, সাং-ঐ;

(৫) মিসেস মিলেস' চাকমা (৪০) স্বামী-লক্ষী কুমার চাকমা, সাং-ঐ।

জানা গেছে, উক্ত ৫ গ্রামবাসীকে আটকের পর তাদেরকে সকাল ৫:০০-৬:০০ টার দিকে বনযোগীছড়া জোন সদরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর কিছুক্ষণ পর জুরাছড়ি উপজেলা সদর সেনাক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, তল্লাশীর সময় গ্রামবাসীদের বাড়িতে অবৈধ কোন জিনিসপত্র পাওয়া না গেলেও উক্ত ৫ গ্রামবাসীকে আটক করা হয়। তল্লাশী চালানোর সময় সেনা সদস্যরা রশ্মী চাকমার বাড়িতে নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা খুঁজে পায়। সেনাসদস্যরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি ভূয়া চাঁদার রশিদ দেখিয়ে ঐ টাকাগুলি চাঁদার টাকা বলে অভিযোগ করে টাকাগুলো নিয়ে নেয়। সম্প্রতি রশ্মী চাকমা ৮০ হাজার টাকায় একটি গরু বিক্রি করে। ঐ টাকারই কিছু খরচ হয়ে গেলেও তখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার টাকা অবশিষ্ট ছিল।

জানা গেছে, সকালে এক পর্যায়ে জুরাছড়ি সেনাক্যাম্পের সেনাসদস্যরা আটককৃত জুম্ম গ্রামবাসীদের জুরাছড়ি থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। পরে দুপুর ১২:৩০ টার দিকে জুরাছড়ি থানা পুলিশ আটককৃতদের নিয়ে বরকল থানায় নিয়ে যায় এবং বরকল থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। পরে বরকল থানা পুলিশ তাদেরকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

মানিকছড়ি বাজারে এক মারমা নারী আটক

গত ২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার বাজার থেকে মানিকছড়ি থানা পুলিশ উপজেলার তুলাবিল গ্রামবাসী অংশৈহা মারমার স্ত্রী চাইওয়ান মারমাকে সকাল আনুমানিক ৮/৯ টার সময় আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তাকে আটকের বিষয়টা মানিকছড়িতে জানাজানি হলে মানিকছড়ি সদরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ থানায় গিয়ে সন্ধ্যে ৭/৮ টার সময় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: শফিকুল ইসলাম এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মেয়েটিকে কি কারনে ধরা হয়েছে জানতে চাওয়া হলে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে হরবিলের লাপাইন্দং পাড়ার সেটেলার বাঙালি মো: আব্দুল মতিনের হত্যা মামলার আসামী হিসেবে ধরা হয়েছে বলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান। সেদিন ধরার পর চাইওয়ান মারমাকে এডিশনাল এসপি এবং দুই মহিলা পুলিশ বেদম মারধর করেন। পরদিন মানিকছড়ি থানার পুলিশ তাকে খাগড়াছড়ি জুডিশিয়াল কোর্টে হাজির করার পর আসামী না দেখিয়ে স্বাক্ষী হিসেবে দেখানো হলে কোর্ট তাকে ৩ অক্টোবর ২০১৫ জামিনে মুক্তি দেয়।

তিন পর্যটককে অপহরণের জেরে বড়থলি ইউনিয়নের মেম্বার, কার্বারী ও গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক ও নির্যাতন

গত ৪ অক্টোবর ২০১৫ বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলা থেকে রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নে যাওয়ার পথে বড়থলির নতুন পুকুরপাড় এলাকায় পর্যটক আব্দুল্লাহ জুবায়ের ও জাকির হোসেন মুন্না ও স্থানীয় গাইড প্রাচিংহাই ম্রোকে অপহরণের ঘটনায় রুমা জোনের সেনাসদস্যরা বড়থলি ইউনিয়নের মেম্বার, কার্বারী ও কয়েকজন গ্রামবাসীকে ক্যাম্পে ডেকে আনে এবং শারীরিক নির্যাতন করার পর

কারাগারে প্রেরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, গত ১২ অক্টোবর ২০১৫ রুমা জোন (২৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট) থেকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ফোন করে জোনে আসতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তারা হলো–

১) পাসিং ম্রো (৪৫), পীং মৃত রিংকাং ম্রো,

পাসিং পাড়ার কার্বারী, রুমা;

২) অনচন্দ্র ত্রিপুরা (৪৫), পীং মৃত হাবুহা ত্রিপুরা,

বড়থলি ইউনিয়নের মেম্বার ও সেপ্রু পাড়া, বিলাইছড়ি;

৩) মেনপন ম্রো, সাবেক ইউপি মেম্বার ও

জারুলছড়ি পাড়া, রুমা;

৪) লাল রাম বম, বগালেইক পাড়া, রুমা;

৫) জয়পাল বড়ুয়া, দোকানদার, রুমা বাজার, রুমা।

তারা রুমা জোনে আসলে 'আলাপ আছে' বলে অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে বান্দরবান ব্রিগেডে নিয়ে যায়। সেখানে তাদেরকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত আটক রেখে সেনা সদস্যরা বেদম মারধর করে। অপরদিকে ১৫ অক্টোবর ২০১৫ রুমা জোনের সেনা সদস্যরা অভিযান চালিয়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে আসে। তারা হলো–

(১) য়ংরুং ম্রো (৩০), পীং নামরেং ম্রো,

বড়থলি ইউনিয়নের মেম্বার ও জারুলছড়ি পাড়া, বিলাইছড়ি;

(২) রিংরাও ম্রো (৩৬), পীং মৃত কাইফা ম্রো,

জারুলছড়ি পাড়া, বিলাইছড়ি;

(৩) মেনপুং ম্রো (৫১), পীং মৃত মেনতে ম্রো,

জারুলছড়ি পাড়া, বিলাইছড়ি।

তাদেরকেও বান্দরবান ব্রিগেডে নিয়ে বেদম মারধর করে। মেনপন ম্রোকে ছেড়ে দিয়ে ২১ অক্টোবর বাকী সবাইকে রুমা থানায় সোপর্দ করা হয়। তাদের মধ্যে পাসিং ম্রো, অনচন্দ্র ত্রিপুরা, রিংরাও মো, য়ংরুং ম্রো এবং মেনপু ম্রো প্রমুখদেরকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে দায়েরকৃত ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত করা হয় এবং বাকী দুজন- লাল রাম বম ও জয়পাল বড়ুয়াকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। রুমা থানায় সোপর্দ করার সময় উক্ত ব্যক্তিদেরকে রুমা সদরের ওয়াই জংশন থেকে আটক করা হয়েছে বলে সেনাবাহিনী মিথ্যা বয়ান দেয় বলে জানা যায়।

রাজস্থলীতে জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাসী ও এক নেতাকে হয়রানি

গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলা সদরে স্থানীয় সেনাক্যাম্পের সুবেদার ইমদাদ এর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য তল্লাশীর নামে হয়রানি করে সেখানে সাংগঠনিক কাজে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক গুণেন্দু বিকাশ চাকমাকে।

জানা গেছে, ঐদিন সকালের দিকে গুণেন্দু বিকাশ চাকমা রাজস্থলী সদরস্থ জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা শাখা কার্যালয় সংলগ্ন কার্যালয় ঘরের মালিক শংকর তঞ্চঙ্গ্যার বাড়িতে অবস্থান করছিল। যখন বাড়ির মালিক শংকর ও তাঁর স্ত্রী বাড়ীর বাইরে ছিলেন, এ সময় সকাল আনুমানিক ১০:০০ টার দিকে হঠাৎ উপজেলা সদর সেনা সাব-জোনের সুবেদার ইমদাদের নেতৃত্বে ১২-১৪ জনের একদল সেনাসদস্য সশস্ত্রভাবে দৌড়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। 'কিছুক্ষণ আগে এদিকে একদল সন্ত্রাসী গেছে' এই অজুহাত দেখিয়ে সেনা সদস্যরা বাড়ীতে ঢুকে জোর পূর্বক তল্লাসী চালায়।

এরপর সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা শাখার অফিস তল্লাসী চালায়। এসময় সুবেদার অপ্রাসঙ্গিকভাবে জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা শাখার সভাপতি পুলুখই মারমার কাছ থেকে এলাকায় কী পরিমাণ চাঁদাবাজি হয়, কী হারে চাঁদা নেয় ইত্যাদি জানতে চাইলে পুলুখই বলেন, 'কে চাঁদাবাজি করে, কত চাঁদাবাজি হয় আমি কিভাবে জানবো। আমরা কোন চাঁদাবাজি করি না। আপনি তো আমাদেরকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারেন না।' এক পর্যায়ে সুবেদারের কাছে একটি ফোনকল আসলে তৎক্ষণাৎ সেনাসদস্যরা সেখান থেকে চলে যায়। গুণেন্দু বিকাশ চাকমা নিজেকে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য বলে পরিচয় দিলেও সেনাসদস্যদের আচরণ ও ভাবভঙ্গী ছিল অসৌজন্যমূলক।

ঠেগা স্থল বন্দর স্থাপন এবং স্থল বন্দরকে ঘিরে ব্যাপক সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের উদ্যোগ

ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ঠেগা ইউনিয়নের ঠেগামুখ এলাকায় একটি স্থল বন্দর নির্মাণ এবং এই স্থল বন্দরকে ঘিরে এ বন্দরের সাথে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর-লংগদু, বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি ও রাজস্থলী উপজেলার সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকার এক উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা হলে এসব এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং বহিরাগত অনুপ্রবেশ জোরদার হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

জানা গেছে যে, গত বছর সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি জেলার উক্ত ঠেগামুখ এলাকায় এবং খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে দু'টি স্থল বন্দর স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে প্রস্তাবিত রামগড় স্থলবন্দর বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব, বিদ্যমান পরিস্থিতি ও জনমিতিগত সমস্যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

৫৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাংগঠনিক সংবাদ

পিসিপির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার উদ্যোগে "নবীন প্রবীণের মিলনে মিলিত হোক মোদের আত্মা, ঐক্যের বন্ধনে গেয়ে যাই মুক্তির বার্তা" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে ভর্তিকৃত ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের এইচএসসি এবং ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতক (পাস) কোর্সের ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের "নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কলেজ শাখার সভাপতি সুমিত্র চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯৯ নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক শিশির চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপা চাকমা। নবীনদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আশিকা চাকমা, স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সহ-সভাপতি কমেশ চাকমা এবং সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের অত্র কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক নিতীষ চাকমা।

উক্ত অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮টি বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্যবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত পাহাড়ে শিশু ও নারী নির্যাতন, ভূমি বেদখলসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দলীয়তন্ত্র ও অস্বচ্ছতার কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান বেহাল অবস্থা হয়ে পড়েছে। তাই নবীন শিক্ষার্থীদের ভালভাবে অধ্যয়নের মধ্যদিয়ে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত হয়ে এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এছাড়া নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য অনুমোদিত একাডেমিক ভবনটি জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ কাজ শুরু করা এবং অবিলম্বে রোডম্যাপ ঘোষণার মধ্যদিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করার জোর দাবি জানান।

পিসিপি'র কাপ্তাই শাখা সম্মেলন ও নবীন বরন

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষে চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করনে ছাত্র ও যুব সমাজের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাপ্তাই থানা শাখার ১২তম, কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ শাখার ১৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাপ্তাই থানা শাখার সাধারন সম্পাদক বাবু মারমা সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কাপ্তাই থানা শাখার সভাপতি এচিং মং মারমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্যে ২৯৯ নং রাঙ্গামাটি পার্বত্য আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার বলেন, সরকার আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর অবস্থায় রেখে এবং চুক্তিকে লঙ্ঘন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করেছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্যবাসীর মতামতকে উপেক্ষা করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এভাবে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে একপাশে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে, পক্ষান্তরে একের পর এক চুক্তিবিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আরও অবনতির দিকে ধাবিত করছে। এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধান এবং এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ উদ্ভূত সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কেনো বিকল্প নেই বলে তিনি জানান। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরো ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই থানা কমিটির সভাপতি বিক্রম

মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোনালিসা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহনচান দেওয়ান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুইনু মারমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নবীনদের বরন করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতাদি শুরু করা হয় এবং সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ১ম অধিবেশন সমাপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে বিকালে অধিবেশনে সতের সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাপ্তাই থানা ও কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ শাখার কমিটি গঠন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও যুব সমিতির বান্দরবান পাইনছড়া ইউনিট কমিটির যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সকাল ১০.৩০টায় বান্দরবান সদর উপজেলায় পাইনছড়া কমিউনিটি মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, পাইনছড়া ইউনিট কমিটির ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এলাকার মুরুব্বি চিকন্যা তঞ্চঙ্গ্যা (কার্বারী) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উছোমং মারমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক উচসিং মারমা, সদস্য অংথোয়াইচিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক মেশৈপ্রু মারমা, যুব সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি যুবনেতা বিষ্ণু চাকমা ও অরুণ ত্রিপুরা প্রমুখ।

সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে বর্তমানে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে চলমান অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার লক্ষে এলাকার আপামর জনগণকে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পরে মালে বমকে সভাপতি, বাচমং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও গান্দিলাল তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য জনসংহতি সমিতির পাইনছড়া ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক উচসিং মারমা। পরবর্তীতে বাসিংমং মারমাকে সভাপতি, হাইনুমং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও থোয়াইসা মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পাইনছড়া ইউনিট যুব সমিতি শাখা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিষ্ণু চাকমা।

পিসিপি'র ঢাকা মহানগর শাখার ২৩তম কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কঠিন বাস্তবতাকে মাথায় রেখে চলমান অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান

'আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আর্দশিক দৃঢ়তায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগই হোক জুম্ম ছাত্র সমাজের দৃপ্ত অঙ্গীকার'- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুর সভাকক্ষে সম্পন্ন হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার ২৩তম কাউন্সিল ও ছাত্র সম্মেলন। সম্মেলনে জেমসন আমলাই-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ক্যারিংটন চাকমার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত বিকাশ ধামাই, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি চঞ্চনা চাকমা। সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের কঠিন বাস্তবতাকে মাথায় রেখে জনসংহতি সমিতির চলমান অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য উপস্থিত জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের আহবান জানান।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা দীপায়ন খীসা বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দকে বিগত সময়ের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অতীতে তারা কিভাবে রাজপথে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিল। শুধু তাই নয় প্রয়োজনে অধিকার আদায়ের জন্য জীবন দানের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি সম্প্রতি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভ্যাট বিরোধী আন্দোলনের সফলতার কথা তুলে ধরে বলেন, যুগে যুগে ছাত্রদের আন্দোলন বৃথা যায়নি ভবিষ্যতেও যাবে না। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ইতিহাস কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস। তাই পিসিপির নেতৃবৃন্দের আরও সংগ্রামী হওয়ার এবং কেবল রাজপথে নয়, শিক্ষা-দীক্ষায় আগুয়ান হবারও আহবান জানান তিনি।

সম্মেলন শেষে ২৩তম কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী পলিটেকনিকসহ ঢাকাস্থ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ত্যাগী ও মেধাবী জুম্ম শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যারিংটন চাকমাকে সভাপতি, সুলভ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুমন মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে আগামী ১ বছর মেয়াদী নতুন ঢাকা মহানগর কমিটি নির্বাচিত করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা।

ঢাকায় পিসিপি'র উদ্যোগে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা সিট বৃদ্ধির দাবিতে মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা সিট বৃদ্ধি করার দাবিতে মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলভ চাকমার পরিচালনায় এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি ক্যারিংটন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত বিকাশ ধামাই, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগরের সদস্য নৈশমং মারমা, রেঙইয়ং ম্রো এবং অমর শান্তি চাকমা প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, নওগাঁ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাগুলোতে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। তাই এসব আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা, নীতিমালা ও উদ্যোগ গহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, "১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৩ (খ) অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে হস্তান্তর করতে হবে।" কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এসবের কোন কিছুই এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তাই মেডিকেল কলেজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন কারণে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বলে উল্লেখ করে বলেন, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করতে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংরক্ষিত কোটা সিট বরাদ্ধ ও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়াও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ও বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবি পেশ করা হয়-

১. আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

২. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা সিট বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনপূর্বক শিক্ষা ক্ষেত্রে আদিবাসী সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তি করতঃ পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সাহিত্য, সংস্কৃতি, রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তী ও ঐতিহ্যসমূহকে সন্নিবেশিত করতে হবে।

পিসিপির টিটিসি, টিএসসি ও রেইছা ইউনিয়ন শাখার যৌথ কাউন্সিল ও সম্মেলন সম্পন্ন

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিটিসি) ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিএসসি)সহ রেইছা ইউনিয়ন শাখার যৌথ কাউন্সিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র ও যুব সমাজ অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করুন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উছোমং মারমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ভাগ্যলতা তঞ্চঙ্গ্যা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উবাসিং মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক উখিংহা মারমা, বান্দরবান সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি মুইয়ই মং মারমা। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকারের গড়িমসি ও কালক্ষেপণের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ চলমান অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কর্মীদের অধিকতর সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। পরে লাললিয়ান বমকে সভাপতি, সুশান্ত তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক ও শৈক্যচিং খেয়াংকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে টিটিসি কমিটি; সুশান্ত তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, মিলন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে টিএসসি কমিটি এবং নয়ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, উসাথোয়াই মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ক্যসিমং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে রেইছা ইউনিয়ন শাখা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা।

পিসিপি'র ১৯তম লংগদু শাখা সম্মেলন ও নবীন বরন

গত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ লংগদু থানা শাখার নবীন বরন ও ১৯তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিনয় সাধন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিলোৎপল খীসা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সভাপতি ত্রিলোচন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি সদস্য অলকা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পুলক চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির লংগদু থানা কমিটির সভাপতি তপন জ্যোতি চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নিলোৎপল খীসা বলেন, কোন জাতির অগ্রগতির প্রথম দিক হচ্ছে সুশিক্ষা। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, এই ভূখন্ডে যে সকল আন্দোলন যেমন -৫২ ভাষা আন্দোলন, ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৭১ মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৮৯ গণ-অভূত্থ্যান ইত্যাদি সফল করেছিল এই ছাত্রসমাজ। বর্তমানেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি থেকে উত্তরনের জন্য ছাত্রসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে সফল করার জন্যে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যের পরে নবীনদের বরণ করে নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে অতিথিদের বক্তব্যের পর সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

লামায় ভূমিদস্যুদর ভূমি বেদখলের চেষ্টাকালে এক গর্ভবর্তী নারীর উপর হামলার প্রতিবাদে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বান্দরবানের লামা উপজেলায় রূপসী ইউনিয়নে ভূমিদস্যু মো: সাইফুল হক ও সেলিম সওদাগরের নেতৃত্বে অবৈধভাবে ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা ও এক আদিবাসী গর্ভবর্তী নারীর উপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে গত ২২ অক্টোবর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে বান্দরবান সদর ও লামা উপজেজলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বান্দরবান সদরে মিছিলটি মধ্যম পাড়াস্থ জনসংহতি সমিতির কার্যালয় হতে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বান্দরবান প্রেস ক্লাব চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি ছাত্রনেতা উবাসিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি মংস্ত মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা, সাংগঠনিক সম্পাদক উখিংহা মারমা, ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন বান্দরবান জেলা শাখার সভানেত্রী শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি বান্দরবান সরকারী কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রুনুঅং মারমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম সমস্যা হল ভূমি সমস্যা। নামে বেনামে বিভিন্ন কৌশলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বেদখলের অপচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলছে। বক্তারা অবিলম্বে ভূমিদস্যু মো: সাইফুল হক ও সেলিম সওদাগরসহ দোষীব্যক্তিদের গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবং ভূমি সমস্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।

গত ২১ অক্টোবর লামা উপজেলায় রূপসী ইউনিয়নে অবৈধ কাগজ দেখিয়ে ভূমিদস্যু মো: সাইফুল হক ও সেলিম সওদাগরের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন ব্যক্তি অবৈধভাবে ভূমি বেদখলের অপচেষ্টা চালায় এবং এসময় তারা এক গর্ভবর্তী আদিবাসী জুম্ম নারীর উপর নৃশংস হামলা চালায়। হামলায় আহত ঐ নারীকে লামা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হলে লাগাতার কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হবে

"পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করুন" দাবিকে সামনে রেখে গত ২৭ অক্টোবর ২০১৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর যৌথ উদ্যোগে রাঙ্গামাটি শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা অনিল মারমা।

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা বলেন, সরকার বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে। চুক্তি অনুসারে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে নানাভাবে জুম্মদেরকে তাদের জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। চুক্তি বাস্তবায়নে আপামর জনগণের দাবি সত্ত্বেও চুক্তি বাস্তবায়ন না করে সরকার জোর করে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র করে চলেছে। চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ মেনে নেবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে পেশীশক্তির জোরে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগুন জ্বলবে এবং তার জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে তিনি জানান। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কাজ অচিরেই স্থগিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান।

জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা বলেন, বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হতে না হতেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্রদের দিয়ে ইতিমধ্যে রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ১৭ অক্টোবর বিতর্কিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত ছাত্র শামসুজ্জামান বাপ্পির নেতৃত্বে কতিপয় বহিরাগত ও ছাত্রলীগের কর্মীরা যৌথভাবে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে জুম্ম ছাত্রদের উপর এবং কলেজের বাইরে জুম্ম পথচারীদের উপর হামলা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হলে ভবিষ্যতে পার্বত্যাঞ্চলে কি ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে উক্ত ঘটনার মধ্য দিয়েই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে তিনি বলেন। বিতর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পিসিপির চলমান জোরালো আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে তিনি অভিমত তুলে ধরেন। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জোরালো আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি কলেজের উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের বিরুদ্ধে গণহারে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দেয়া হয়েছে। হামলা-মামলা করে জুম্ম জনগণের আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না, বরং আরো জোরদার হবে বলে তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি জড়িতা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা প্রমুখ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, জনমতের বিপরীতে গত ১০ জানুয়ারী ২০১৫ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করতে গিয়ে রাঙ্গামাটিতে মারাত্মক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। জনমতকে উপেক্ষা করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রহরায় জোর করে কথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হলে তার ফল কখনোই শুভ হবে না বলে নেতৃবৃন্দ জানান। এমনিতর অবস্থায় সরকার যদি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচির মত কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হবে।

---

৫৩ পৃষ্ঠার পর

ঠেগা স্থল বন্দর স্থাপন এবং স্থল বন্দরকে ঘিরে ব্যাপক সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের উদ্যোগ

আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে সরকার উক্ত ঠেগা বন্দর স্থাপনের যাবতীয় প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বাঘাইছড়ি-হরিণা-ঠেগা, নানিয়ারচর-লংগদু-হরিণা-ঠেগা, কাপ্তাই- বিলাইছড়ি- জুরাছড়ি- ঠেগা, রাজস্থলী- জুরাছড়ি- ঠেগা ইত্যাদি ব্যাপক সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এসব সড়ক নির্মিত হলে রিজার্ভ ফরেষ্টের বনজ সম্পদ উজার হয়ে পড়বে। এতে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। অধিকন্তু বহিরাগতদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম-অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে চরমভাবে ক্ষতি করবে। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নৌ চলাচলের জন্য কাপ্তাই হ্রদের কর্ণফুলী নদীও ড্রেজিং করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়

অ্যালবাম

১০ নভেম্বর ২০১৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্মরণ সভা

আলোচনা সভা

"পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।"

-মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা